রণাঙ্গনে ভারত-জোয়ান

রণাঙ্গনে ভারত-জোয়ান

[ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অখণ্ডতা রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ দেশনায়ক ও বীরসেনানীদের জীবনালেখ্য]

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি. কম., বি. এ.
কর্তৃক সম্পাদিত

ব্যানার্জি ব্রাদার্স
১৮-এল, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

গত পাক-ভারত যুদ্ধে যে সকল ভারত-জোয়ান দুর্জয় সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং যারা নিজেদের জীবন দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এবং জাতীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাদেরই কয়েকজনের বীরত্ব কাহিনী ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে এই গ্রন্থ সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বেতার বক্তৃতা, ধারাবিবরণী প্রভৃতি থেকে তথ্য এবং পরিসংখ্যান গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে দৈনিক পত্রিকা 'আনন্দ বাজার', 'যুগান্তর', 'বসুমতী' এবং 'দেশ'-এর উপর নির্ভর করেছি। উক্ত পত্রিকাসমূহের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। ২২ দিনের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ধারাবাহিকরূপে সন্নিবেশিত করেছি।

বর্তমান সংস্করণে বাংলাদেশ ও ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধও যুক্ত করেছি।

যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে আমাকে সাহায্য করছেন তাঁদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার।

৬।১।১, সরসুনা মেইন রোড
কলিকাতা-৬১

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

যে সকল জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত ভারত-জোয়ান দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, সেই সকল শহীদদের উদ্দেশ্যেই 'রণাঙ্গনে ভারত-জোয়ান' উৎসর্গিত হল।

সূচীপত্র

পাকিস্তানের জেঃ নিয়াজী ভারতের বিজয়ী বীর লেঃ জেঃ অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করছেন
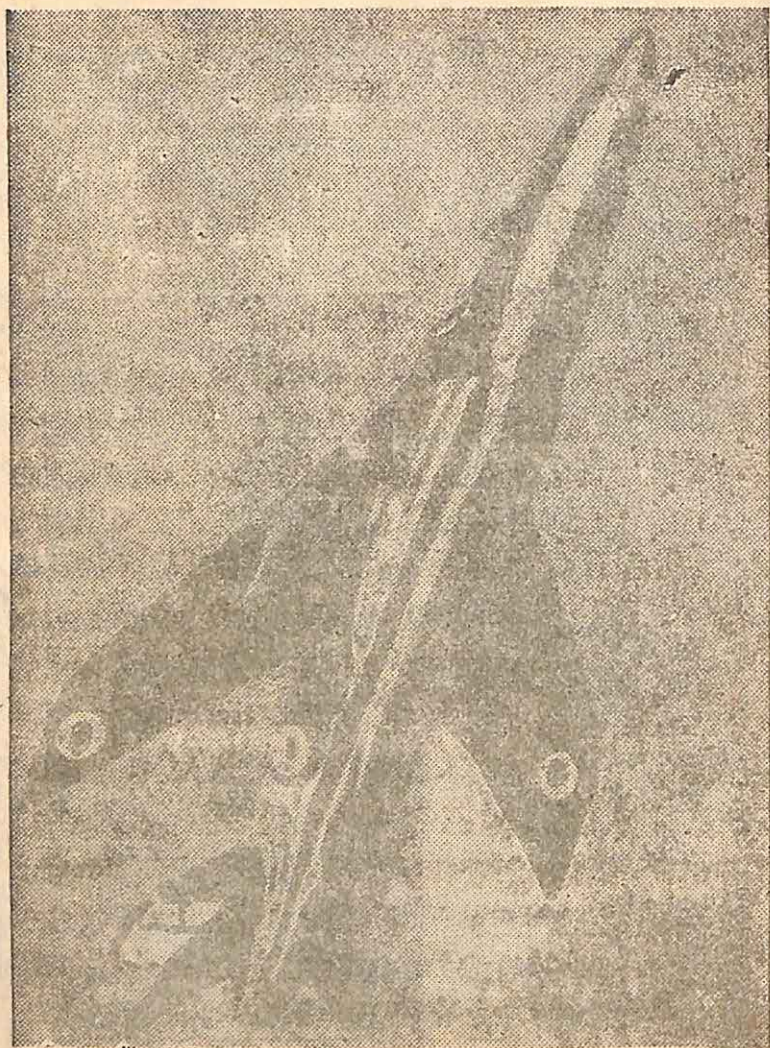
ভারতীয় বিমান ন্যাট ফাইটার

॥ ভারতে নব অধ্যায়ের সূচনা ॥

বাঙলার কবি একদিন গেয়েছিলেন, **"ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"** কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে। কেমন করে সম্ভব হ'ল আজ তা সংক্ষেপে বলব।

প্রায় দুশো বছর আগে পলাশীর যুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তি ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করে। কবি রবীন্দ্রনাথ একে "বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল" বলে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজ শুধু রাজদণ্ড হাতে নিয়েই আসে নি, ভারতবর্ষকে নানা ভাবে শোষণ করেও নিয়েছে। পরাধীনতার এই বন্ধন কি করে কাটবে, দেশের সুসন্তানরা সে কথা ভাবতে এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা করতে লাগলেন। পলাশীর যুদ্ধের একশো বছর পরে সিপাহীদের সঙ্গে ইংরেজ রাজশক্তির বিপুল সংঘর্ষ হয়। একে তো বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের যোগ ছিল না, তাতে আবার সব সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেয় নি ; সুতরাং ইংরেজ সৈন্যের কাছে সিপাহীদের হার মানতে হল।

বিদ্রোহ দমনকল্পে ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা খুবই কম পাওয়া যায়। ইংরেজেরা অপরাধী এবং নিরপরাধ স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু

নির্বিশেষে ভারতীয়দের হত্যা করে। তাদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়, গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করে; প্রত্যেক শহরে ভারতীয় সৈন্যদের বিনাবিচারে ফাঁসীতে লটকানো হয়। এইভাবে হাজার হাজার সিপাহী মৃত্যুর কবলে পতিত হয়—দেশে অশান্তি লেগেই থাকে।

১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে ভারতে আসেন। কার্জনের আমলে একটির পর একটি করে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'তে থাকে; কলকাতা কর্পোরেশনের স্বাধীনতা হরণ, বিদেশ হ'তে ভারতে আগত তারবার্তা সেন্‌সর, শিক্ষকদের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ এবং বিদেশী শিল্পের সুবিধার জন্য স্বদেশী দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা প্রভৃতি কার্জনের কুকীর্তি সমূহের কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত। লর্ড কার্জনের সবচেয়ে বড় কুকীর্তি বঙ্গ-বিচ্ছেদ।

১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে

এক ভাগে পূর্ববঙ্গ ও আসাম, অন্য ভাগে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দুইটি প্রদেশ করা হয়। দেশবাসী বুঝেছিল, বাঙলাদেশ বিদেশী শাসন সহ্য করতে চায় না দেখে কর্তারা বঙ্গ-ভঙ্গের দ্বারা অসন্তোষের শিকড় উপড়ে ফেলতে চান। ফল হ'লো বিপরীত। **বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ,**

দেশপ্রেমিক বিপিন চন্দ্র, কর্মযোগী অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃবর্গ সমস্ত দেশে দেশপ্রেমের বন্যা বহালেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে ভাঙ্গা দেশ আবার জোড়া লাগল, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন সত্বেও ইংরেজের অধীনতা হতে দেশ মুক্তি পেল না।

১৯১৪ সালে গান্ধীজী আফ্রিকার কাজ শেষ করে ভারতবর্ষের কাজ করবার জন্য এলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মনে করেছিলেন, সত্য ও অহিংসার বলে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনতে পারবেন, ভারতের জন গণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারবেন, ভারতবাসীর মনে সত্য ও অহিংসার প্রতি অনুরাগ জন্মাতে পারবেন। কিন্তু ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী ভোটের জোরে **রৌলট আইন** পাশ হ'য়ে গেল। এই আইনের বলে পুলিশ ও শাসক-বর্গকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। সমগ্র ভারতে এই আইনের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ আরম্ভ হ'ল। মহাত্মা গান্ধী এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি স্থির করলেন যে, একই দিনে সমগ্র ভারতবর্ষে হরতাল করতে হবে। এই হরতালই হয়েছিল **প্রথম সব-**

মহাত্মা গান্ধী

ভারতীয় হরতাল। ৬ই এপ্রিল হরতালের দিন ধার্য হল। ঐদিন সকলে চব্বিশ ঘণ্টা অনশনে থাকবে, হাট-বাজার বন্ধ থাকবে এবং নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে সভা করে রৌলট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

এই সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সরকার ১৩ই এপ্রিল তারিখে এক বিজ্ঞপ্তিতে সভাসমিতি অবৈধ বলে ঘোষণা করল। জেনারেল ডায়ার শুনতে পেল যে, কাহানিয়ালালের সভাপতিত্বে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। জেনারেল ডায়ার বহু সৈন্য ও গোলাগুলী নিয়ে আইন ভঙ্গকারীদের শায়েস্তা করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগে তখন সহস্র সহস্র জনতা সভাস্থলে উপস্থিত। জেনারেল ডায়ারের আদেশমত ইংরেজ সৈন্য ঐ বাগের এক মাত্র ফটক জুড়ে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। সৈন্যরা দশ মিনিট কাল ধরে বেপরোয়াভাবে বৃদ্ধ, বালক, যুবক, নর-নারী নির্বিশেষে গুলী বর্ষণ করে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ রক্ত-নদীতে পরিণত হয়। সরকারী হিসাবে তিনশত উনিশ জন নিহত এবং দেড়-হাজার গুরুতর রূপে আহত হয়। আর বেসরকারী হিসাবে দেড় হাজার লোক নিহত হ'য়েছিল বলে প্রকাশ। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে গান্ধীজী অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েন এবং এর অল্পকাল পরেই সত্যাগ্রহ, খিলাফৎ এবং অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলাদেশে এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধু একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, কবি, ভাবুক ও দাতা। নিজের প্রকাণ্ড ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি, তিনি সর্বস্ব দেশের হিতকল্পে বিলিয়ে দেন। ব্যারিষ্টারীর প্রকাণ্ড পশার সত্ত্বেও তিনি আদালত বর্জন করেন। মনে প্রাণে দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলে গান্ধীজী তাঁকে "দেশবন্ধু" নাম দিয়ে দেশবাসীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বাংলা দেশের বিপুল লোক তাঁর আদর্শে রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে জুটলেন। **দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ, তরুণ সুভাষচন্দ্র** এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হলেন। দেশের দুর্ভাগ্য, ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন বাংলার জাতীয় নেতা দেশবন্ধু পরলোক গমন করেন। তাঁর শেষযাত্রায় অনুগমন করতে রাজপথে আর লোক ধরে না। কেওড়াতলা শ্মশানে গেলেই প্রথমে চোখে পড়বে দেশবন্ধুর সমাধি মন্দির।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধুর উপযুক্ত পরিচয় কবি রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে দিয়েছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার ভরসা দিয়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন ভারতবাসীকে নিমন্ত্রণ করলেন। লণ্ডনে 'গোলটেবিল বৈঠক' বসল কিন্তু তার পূর্ব হতে সুভাষচন্দ্র অধীর আগ্রহে বলে উঠলেন, "সুদূর অনিশ্চিত ভবিষ্যতে স্বাধীনতার প্রার্থী আমরা নই, পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের অবিলম্বে চাই।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদ পেয়ে তা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তরুণ ভারত তাঁর ত্যাগে, তেজস্বীতায়, কর্মনিষ্ঠায় মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে নেতৃত্বপদ দিয়েছিল। তাঁর অবিলম্বে সংগ্রামে যোগ দেওয়ার আহ্বান দেশ-বাসীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে বার বার কারারুদ্ধ করে আটক করে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারে নি —১৯৪১ সালে তাঁর চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ ত্যাগ করে একেবারে ইউরোপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন ইংরেজ ও তাঁর মিত্রপক্ষীয়দের সঙ্গে জার্মান এবং জাপানের যুদ্ধ চলছিলো। এই যুদ্ধই **দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ**। সুভাষচন্দ্র দেখলেন দেশ স্বাধীন করতে হলে এই উপযুক্ত অবসর। এই সময় জাপান পার্ল হার্বার আক্রমণ করে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে মালয়, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও, জাভা প্রভৃতি অধিকার ক'রে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ব্রিটীশ শক্তির যখন চরম অবস্থা তখন ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতবর্ষে আগমন করেন। ক্রীপস্ জানালেন, "যদি ভারতবাসী ব্রিটীশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে, তা'হলে যুদ্ধ শেষে ভারতবাসীকে অখণ্ড ভারতে অখণ্ড স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তাতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার কোন প্রশ্ন থাকবে না।" ভারতীয় কংগ্রেস ক্রীপস্কে বললেন আগে যদি আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার কর তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করতে পারি।

ক্রীপস্ বললেন, "এখন ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব নয় কারণ এ ব্যবস্থা হওয়ার পূর্বেই জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করবে।" মহাত্মা গান্ধী ক্রীপস্কে জানিয়ে দিলেন, "ভারতবর্ষকে জাপানের হাত থেকে ব্রিটীশকে রক্ষা করতে হবে না, সর্বাগ্রে ব্রিটীশের এই দেশ হ'তে সরে পড়া উচিত।" তখন ক্রীপস্ ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে দেশে ফিরে গেলেন।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপান কর্তৃক ধৃত সৈন্য ও বেসামরিক লোকদের নিয়ে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন এবং নামকরণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হয়।

আজাদহিন্দ ফৌজের প্রতিনিধিগণের সভায় শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বসু বলেছিলেন, "আজ আমি এই সংঘের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রকেই বরণ করতে চাই। সুভাষচন্দ্র জার্মানী ও অন্যান্য রাষ্ট্র হতে ভারতের সর্বাধিনায়ক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। ভারতীয় জনগণের উপর তাঁর প্রভাব মহাত্মা গান্ধীর পরেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ক'রে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন এবং ভারতের জনসাধারণের

তিনি পূজো পেয়েছেন। যদি সুভাষচন্দ্র আমাদের সংঘের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন তাহলে আজাদহিন্দ ফৌজ ভারত আক্রমণ করলে সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীদেরও এই যুদ্ধে নিযুক্ত করতে পারবেন।"

নেতৃত্ব গ্রহণ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদহিন্দ বাহিনীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকগণ! আজ আমাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা গর্বের দিন। আজ অমরা জগতের সমক্ষে ভারতের মুক্তিসেনা গঠনের কথা প্রচার করতে পারছি। যে সিঙ্গাপুর একদিন ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল, আজ সেই সিঙ্গাপুরে আমাদের এই সেনাবাহিনী রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে দণ্ডায়মান। বন্ধুগণ, আমাদের এই সেনাবাহিনী ব্রিটীশের কবল হতে ভারতকে মুক্ত করবে। প্রত্যেক ভারতীয়ই এই ভেবে গর্বে স্ফীত হবে যে, আমাদের এই সৈন্যবাহিনী কেবলমাত্র ভারতীয়দের দ্বারাই গঠিত—ভারতীয় সমরনেতাদের দ্বারা পরিচালিত। যখন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হবে তখন এই সৈন্যদল ভারতীয়দের নেতৃত্বে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করবে।

ব্রিটীশ সাম্রজ্যবাদের ধ্বংসের দিন সমাগত। শীঘ্রই ভারতের প্রত্যেক শিশুটি পর্যন্ত অনুভব করবে যে, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ অতীতের অলীক কাহিনী মাত্র। তোমাদের সমরধ্বনি হবে '**দিল্লী চলো, দিল্লী চলো**'। জানি না, আমাদের এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা ক'জন বেঁচে থাকব; কিন্তু একথা নিশ্চিত যে আমরা ভারতকে স্বাধীন করতে পারব। ভগবান আমাদের সেনাদলকে আশীর্বাদ করুন এবং আসন্ন যুদ্ধে আমাদের বিজয়গৌরব অর্পণ করুন।"

১৯৪৪ সালে আজাদহিন্দ ফৌজ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ইম্ফল, মণিপুর ও কোহিমা অধিকার করল। তখন প্রত্যেক যুদ্ধে আজাদহিন্দ ফৌজের জয় হতে লাগল। শত্রুপক্ষও প্রবল বেগে তাদের প্রতিরোধ করতে লাগল। ভারতের ভাগ্যাকাশ আবার তমসাচ্ছন্ন হ'ল। নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। ফলে যুদ্ধোপকরণ সময়মত পৌঁছান সম্ভব হ'ল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাদ্যাভাবের জন্য আজাদহিন্দ ফৌজ পিছু হটতে লাগল এবং বহুসংখ্যক সৈন্য শত্রুহস্তে বন্দী হ'লো।

১৯৪৫ সালে জার্মানী, জাপানি ও আজাদহিন্দ ফৌজের পতন হ'লো। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট রেডিওতে নেতাজী আজাদ-হিন্দ ফৌজকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হ'তে বললেন—ইহাই তাঁর শেষ বাণী।

তিনি ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে বিমানে টোকিও যাত্রা করেন এবং বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হন। নেতাজী জীবিত আছেন কিনা সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছু জানা যায় নি।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইংরেজ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হল। ২০শে ফেব্রুয়ারী ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করে ভারত পরিত্যাগ করবেন। কার হস্তে এই স্বাধীনতা অর্পণ করা হবে এই প্রসঙ্গে মুশ্লীম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। মুশ্লীম লীগের নেতা কায়েদ-ই-আজম জিন্না বললেন যে মুসলমানরা পাকিস্তান না পেলে মোটেই সন্তুষ্ট হবেন না। তারপর মন্ত্রীমিশন ভারতে এসে সকল

দলকে সম্মেলনে আহ্বান করেন। মুশ্লীম লীগের পক্ষে মিঃ জিন্না মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করেন। ঐ হাঙ্গামা কলিকাতা ও পরে নোয়াখালিতে বিস্তৃতি লাভ করে। হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হতাহত হয় এবং বহু ধনসম্পত্তি ও গৃহ ভস্মীভূত হয়। এর প্রতিক্রিয়া বিহারেও দেখা দেয়। তখন লর্ড ওয়াভেল, মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে এর মীমাংসা করার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। তখন বিলেত হতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট করে ভারতে প্রেরণ করা হয়। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে একটা সমাধানে উপস্থিত হলেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন যে ১৫ই আগষ্ট ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করে চলে যাবেন। মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না এই ঘোষণা সকলকে গ্রহণ করতে বললেন। ঐ ঘোষণা অনুযায়ী ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করা হল—এক ভাগ ভারত ইউনিয়ন ও অপরটি পাকিস্তান। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ বিদেশীর শাসন হতে মুক্তি পায়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠল। মহাত্মাজী সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যখন মহাত্মাজী এসে দাঁড়ালেন সেই রক্তাক্ত-ভূমিতে তাঁর শান্তি ও অহিংসার বাণী নিয়ে, তখন তাঁর উপস্থিতিতে প্রত্যেক স্থলেই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। তিনি যখনই যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানেই উন্মত্ত জনসাধারণ শান্তভাব অবলম্বন করেছে।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় প্রার্থনা সভায়

যাওয়ার সময়ে **নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে** নামক এক ভ্রষ্টমতি হিন্দু যুবক তাঁকে গুলী করে। তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন এবং কিছু সময় পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ভাবেই অহিংসার প্রচারক গান্ধীজী হিংসার আঘাতে নিহত হন।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন দেশবরেণ্য নেতা **ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ**। তিনি অবসর গ্রহণ করবার পর রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান দার্শনিক **সর্বপল্লী ডক্টর রাধাকৃষ্ণন**। দু দুবার রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের পর তিনি আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও 'নয়া তালীমের' স্রষ্টা **ডঃ জাকির হোসেন** বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচনে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপতির পদে বৃত হয়েছিলেন। তাঁহার অকপট ও উদার নেতৃত্বে দেশ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে।

শ্রী ভি. ভি. গিরি

১৯৬৯ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে রাষ্ট্রপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

শ্রী ভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিযোগিতা করবেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯শে জুলাই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির

পদ ত্যাগ করেন। তখন রাষ্ট্রপতির কর্তব্য পালনের জন্য ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী এম. হিদায়েত উল্লা শপথ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য শ্রীসঞ্জিব রেড্ডি, শ্রী সি. ডি. দেশমুখ এবং আর অনেকে প্রার্থী ছিলেন। নির্দলীয় প্রার্থী শ্রী ভি. ভি. গিরি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীসঞ্জিব রেড্ডিকে তীব্রতম প্রতিযোগিতায় বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া জয়ী হন। শ্রী গিরির সাফল্যের জন্য প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

২৪শে আগষ্ট সংসদের সেণ্ট্রাল হলে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহ গিরি ভেঙ্কট গিরি শপথ গ্রহণ করেন। ৯টা ৭ মিনিটের সময় এক আরম্বরপূর্ণ পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জে. সি. সাহ শপথবাক্য পাঠ করান। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণ থেকে ৩১ বার তোপধ্বনি করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির পত্নী সরস্বতী গিরিও উপস্থিত ছিলেন।

নৌবাহিনীর তৎকালীন প্রধান এ্যাড্মিরাল এ. কে. চ্যাটার্জী, সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানকেশ এবং বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ্ মারশাল পি. সি. লাল রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানান। ঐদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। সহস্র-সহস্র ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, আইন ব্যবসায়ী, শিশু ও স্ত্রীলোকের ভীড়ে ভবন প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। শ্রী গিরি নির্বাচনে তাঁর সাফল্যকে 'সাধারণ মানুষের জয়' বলে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন—দেশে সমৃদ্ধি ও বিশ্বে শান্তির জন্য চাই কঠোর

শ্রম, সুশৃঙ্খল আচরণ ও আন্তরিক ঐক্য। যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে। যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে। যে চলতে শুরু করে, তার ভাগ্যও চলতে শুরু করে। কাজেই ভারতবাসী এগিয়ে চল—এগিয়ে চল। তিনি আরও বলেন—"আমি বরাবরই জনগণের সেবক। রাষ্ট্রপতি হিসেবেও যতদিন বেঁচে থাকব আমি জনগণের সেবা করে যাব।"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম প্রধামন্ত্রী হন জনপ্রিয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। পণ্ডিতজী শুধু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, পররাষ্ট্র বিভাগও তাঁরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে বলেছিলেন, "দীর্ঘ দিনের সুপ্তির ও সংগ্রামের পরে ভারত আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। জাগ্রত, তেজোদীপ্ত, মুক্ত স্বাধীন ভারত। প্রাচ্যের আকাশে এক নতুন-তারকার উদয় হলো। দীর্ঘ কালের স্বপ্ন আজ বাস্তবরূপ গ্রহণ করল। এই তারকা যেন আর অস্ত না যায়. এই আশা যেন চক্রান্তে বিনষ্ট না হয়, ইহাই কামনা করি।" তিনি গান্ধীজীর বিষয়ে বলেছিলেন, "যিনি এই জাতির পিতা, এই স্বাধীনতার যিনি স্রষ্টা, প্রাচীন ভারতের আত্মার যিনি মূর্ত প্রতীক, স্বাধীনতার মশালে যিনি আমাদের তমসাচ্ছন্ন আকাশ আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন আজ সর্বাগ্রে তাঁকে স্মরণ করি।"

পণ্ডিতজী ক্রমশই ভারতকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে লাগলেন।

সর্বপ্রথমই তিনি শিক্ষা বিস্তারের উপর লক্ষ্য দিলেন। রাষ্ট্রের ভিত্ তিনি ক্রমশই সুদৃঢ় করতে লাগলেন। বিশ্বে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য দেশ বিদেশের রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। অল্পদিনের ভিতরেই ভারতবর্ষের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। পণ্ডিত জওহরলালকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। বাপুজীর শোচনীয় মৃত্যু, দেশ জোড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ, বিশ্বাসঘাতকতা—কত বাধা, কত বিঘ্ন অতিক্রম করে তাহাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। ১৯৬৪ সালের মে মাসের ২৭ তারিখ ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত বিষাদক্লিষ্ট দিন। এই দিনেই দ্বিপ্রহরে প্রিয় জহরলাল নেহেরু লোকান্তরিত হয়েছেন। পণ্ডিত নেহেরুর তিরোধান ঘটেছে কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের প্রেরণা কোনদিনই ব্যর্থ হবে না। তাঁর মহাযাত্রার সময় কোটি কোটি মানবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, **"নেহেরু অমর রহে।"**
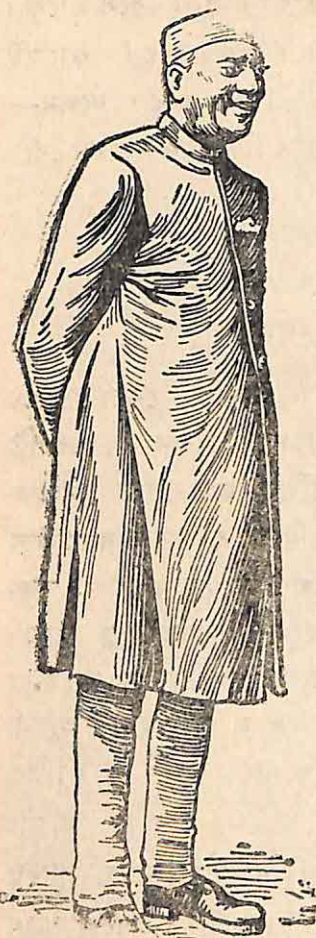
পণ্ডিত জওহরলাল

ভারতরত্ন লালবাহাদুর শাস্ত্রী

শ্রদ্ধেয় জওহরলাল নেহেরু পরলোক গমন করলে ১৯৬৪ সালের জুন মাসে শ্রদ্ধেয় লালবাহুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯০৪ সালের ২রা অক্টোবর লালবাহাদুর শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর ছিল অটুট মনোবল। তাঁর পিতার নাম ছিল সারদাপ্রসাদ, মাতার নাম রামদুলালী এবং স্ত্রী ললিতা দেবী। লালবাহাদুর শাস্ত্রী কাশী বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে শ্রীশাস্ত্রীকে দীর্ঘকাল কারাবাস করতে হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে তিনি উত্তর প্রদেশের সাধারণ কংগ্রেসের সেক্রেটারী হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পুলিশ ও যানবাহন মন্ত্রী ছিলেন। প্রথম নির্বাচনে তিনি ছিলেন রেলমন্ত্রী। ১৯৫৮ সালপর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুর মৃত্যুর পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার সময়েই দু'ভাগে বিভক্ত হয়—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান। স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ভারতবর্ষকে উত্যক্ত করতে থাকে।

১৯৬২ সালে চীন সবলে তিব্বত অধিকার করে। চীনের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করবার জন্য ভারত তিব্বত ছেড়ে দেয়। চীন তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সীমান্ত লঙ্ঘন ক'রে ভারতের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়। কাশ্মীরে লাদাক অঞ্চল ও ম্যাকমোহন লাইনের দক্ষিণে আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল এবং হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত আরো কয়েকটি স্থানের উপর চীনারা অধিকার দাবী করে। কিন্তু ভারত দাবী অস্বীকার করে। ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর লাদাক ও উত্তর-পূর্ব সিমান্তে আক্রমণ চালিয়ে চীন ভারত-সীমান্তের এক বিশাল অঞ্চল দখল করে নেয়। এই নগ্ন আক্রমণের বিভৎসতায় চীনের বিরুদ্ধে ভারতের অসন্তোষ ও বিদ্বেষ দেখা দেয়।

দেশরক্ষার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে পূর্ণ উদ্যোগ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। ভারতীয় সৈন্য অসীম বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে এই বিশ্বাস-ঘাতকদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। আক্রমণের একমাস পরে চীনারা পশ্চাৎ অপসরণ ক'রে এক যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা স্থির করে; কিন্তু চীনাদের নির্ধারিত সীমারেখা ভারত স্বীকার করে না। অন্যদিকে পাকিস্তান কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীর ও জম্মুর প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। পাকিস্তান ভেবেছিল হানাদার পাঠিয়ে একটা অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করবে এবং কাশ্মীরের মুসলমানরা তাদের সাহায্য করবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ ক'রে পাকিস্তানের বিজয় পতাকা ওড়াবে। কিন্তু ফল হল অন্যরূপ।

হানাদাররা কাশ্মীরে যখন মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে তাদের বর্বর নির্যাতন চালাতে থাকে, তখন কাশ্মীরের মুসলমান, অমুসলমান এবং সকল শ্রেণীর লোক পাক-হানাদারদের প্রতিরোধ

করে। কাশ্মীরীদের হস্তে বহু পাক হানাদার ধৃত ও বন্দী হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাক-হানাদারদের নিকট হ'তে বহু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। এর কিছুদিন পরেই পাকিস্তান ভারতের কাশ্মীর, আসাম, ও উত্তরবঙ্গ সীমান্তে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করে।

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী পাকিস্তান ও রাষ্ট্রসংঘে প্রতিবাদ জানান। ভারত শান্তি-কামী এবং ভারতের কোন যুদ্ধ লিপ্সা নেই। তবে কোন শক্তি যদি ভারতের শান্তি বিঘ্নিত করে বা ভারতভূমির এক ইঞ্চি জমি দখল করে তবে ভারতবর্ষ অস্ত্রবলেই তার মোকাবিলা করবে। পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার এতে কর্ণপাত না করে ভীষণ হিংস্রভাব ধারণ করে। আমেরিকা হতে পাওয়া স্যেবার জেট বিমান এবং মারাত্মক প্যাটন-ট্যাঙ্ক বাহিনীর দ্বারা সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারত ভূমিতে ঢুকে পড়ে। শান্তিকামী ভারত এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী পাকিস্তানকে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীরের এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও পাকিস্তানের করতলগত হতে দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনানায়কদের নির্দেশ দিলেন ভারতের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। ভারতবাসী দেশরক্ষার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল। বাইশ দিন ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভারত-জোয়ানরা দেশরক্ষার জন্য শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শত্রু কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে। রাষ্ট্রের এই গুরুতর বিপদের সময় তিনি
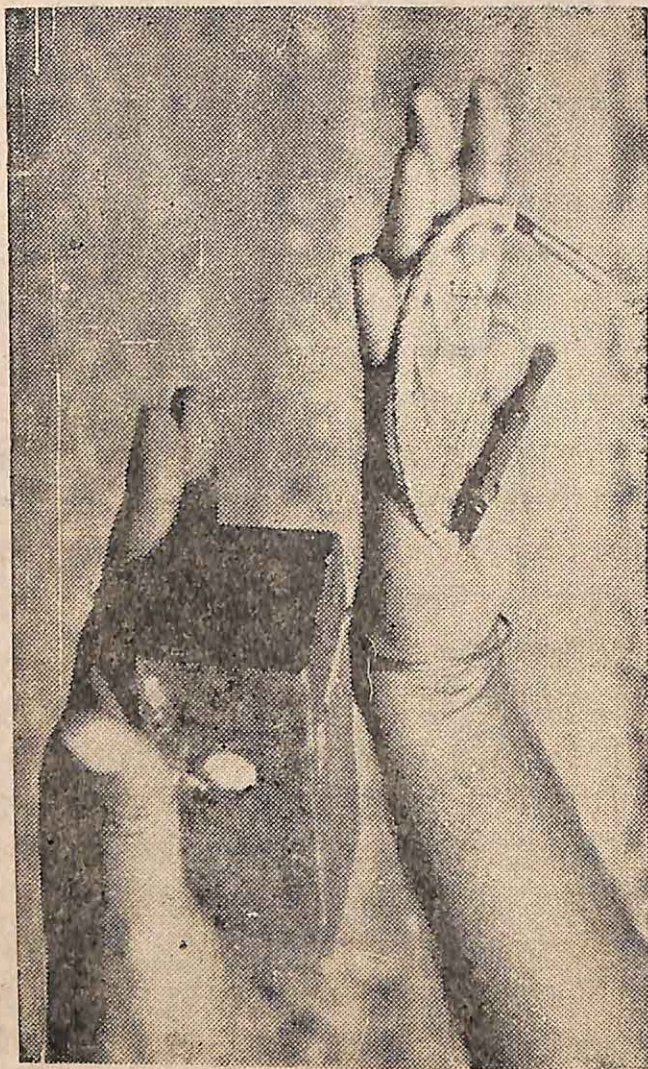
পাক-হানাদারদের নিকট হতে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার

সুযোগ্য কর্ণধারের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শক্তিশালী মনোবলই ভারতবাসীকে শত্রুনিধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ ও ভারতের জয়যাত্রা

আগষ্ট মাসের শুরু থেকেই দলে দলে হাজার হাজার পাক-হানাদাররা কাশ্মীরে আসতে লাগল। আগুনে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লুঠতরাজ করে ওরা পৌঁছে গেল শ্রীনগরের কাছে। কাশ্মীরী জনসাধারণ মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সংঘবদ্ধ হল—সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল ভারতীয় ফৌজ। বহু হানাদার প্রাণ হারাল, অনেকে পালিয়ে গেল, বাকী কিছু ধরা পড়ল ভারতীয় ফৌজের কাছে। আগষ্টের ৯ তারিখের মধ্যেই পাকিস্তান বুঝতে পারল কাশ্মীরের জনসাধারণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গুলী খাওয়া বাঘের মত পাকিস্তান এবার ভারতকে আক্রমণ করে বসল কারগিল এবং ছামব্ খণ্ডে। ভারত-জোয়ানরাও প্রচণ্ড বিক্রমে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে শুরু করল। গুলীর জবাবে গুলী চলল।

১লা সেপ্টেম্বর—পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে ছামব্ জাউরিয়ান খণ্ডে ঢুকে পড়ল। নানারকম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং প্যাটন ট্যাঙ্কের মিছিল নিয়ে তারা এগিয়ে আসতে লাগল। বেলা সাড়ে এগারটার সময় ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে দিল। তাদের সঙ্গে ছিল দুই রেজিমেণ্ট প্যাটন ট্যাঙ্ক আর এক ব্রিগেড

জোয়ানদের গুলীতে নিহত হানাদার

পদাতিক। ভারতীয় ব্যাটিলিয়ানের সদর দপ্তর ঝাঁ-নগর পাক গোলায় কেঁপে উঠল। প্রথমে ভারতীয় বাহিনী কিছুটা হটে এল। ওখানটায় মুন্নাওয়ার তাওয়াই নামে একটি নদী আছে। ভারতীয় বাহিনী নদীর এপারে সরে এল।

২রা সেপ্টেম্বর—পাকিস্তান বাহিনী ভারতীয় ফৌজ হটে যাচ্ছে মনে করে বিজয়ের উল্লাসে নদী পার হয়ে এগিয়ে এল। তারপর শুরু হল পাল্টা মারের খেলা। ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং স্থল-বাহিনী স্থলে, অন্তরীক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে। শত্রুর পরাক্রম চূর্ণ করে দিয়ে এগিয়ে চলল বিজয়ের মুখে। ভারতীয় বাহিনী ঐ দিনই পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে আঠারখানা। ভারতীয় বীর-সৈনিকগণ পাকিস্তানকে উড়িপুঞ্চ, তিথোয়াল ও হাজি পীর এলাকাতেও প্রতিহত করল। একটির পর একটি ঘাঁটি ভারতীয় সৈনিকদের পদানত হতে লাগল।

৩রা সেপ্টেম্বর—আখনুর-ছামব্ এলাকায় এক বিমান লড়াইয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনী দুটি এফ্ ৮৬ স্যেবার জেট্ বিমানকে ভূপাতিত করে। এ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান প্যাটন ট্যাঙ্ক, স্যেবার জেট, ন্যাপাম্ (Naplam) বোমা, কোব্রা, মিসাইল আরো অনেক মার্কিনী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রতিবাদ জানায় কারণ মার্কিন শর্তে উল্লেখ ছিল, পাকিস্তান ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে না। পাকিস্তান ভেবেছিল নৌসেরা-রাজাউড়ি, পুঞ্চখণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় ফৌজের যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়ে প্রথমে আখনুর দখল করবে এবং পরে শিয়ালকোট থেকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে জম্মু অধিকার করবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—পাকিস্তানী স্তেবার জেট্ শিয়ালকোট জম্মু-রোডের উপর রকেট ছোড়ে। শিয়ালকোট পাসুর এলাকায় জমায়েত হল পাকিস্তানী গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী। লাহোরখণ্ডেও বিপুল সৈন্য সমাবেশ হল। এদিকে ছামব্-জাউড়িয়ানখণ্ডে চালিয়েছে ভূমি দখলের তৎপরতা।

৫ই সেপ্টেম্বর—অমৃতসরে আমাদের বিমান ঘাঁটির উপরে বোমা ফেলে চলে যায়।

৬ই সেপ্টেম্বর—ভারতীয় ফৌজ পাকিস্তানের সাহসের সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে দেখে ৬ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে এগিয়ে চলল লাহোরের দিকে। ত্রিশ মাইল এলাকা জুড়ে তিনদিক থেকে একসঙ্গে চালাল ত্রিমুখী আক্রমণ। ওয়াগা-ডোগরাই, খালরা-বারকি এবং খেম্‌করণ-কাসুর। ডেরাবাবা নামক এলাকাতেও ভারতবাহিনীর হস্তে পাকিস্তানী সৈন্য মার খেয়ে হটে গেল। ইরাবতী নদীর উপর সেতুটা পাকিস্তানীরা নিজেরাই উড়িয়ে দিয়েছিল। পাক্ সাঁজোয়া বাহিনী তখন ভারতীয় জমি দখলের আশা ত্যাগ করে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেইদিন রাত্রেই পাকিস্তানী ছত্রী-সৈন্য নামিয়ে দিল শ্রীনগরে, দিল্লীর উপকণ্ঠে, পশ্চিমবঙ্গে, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের নানাস্থানে। কিন্তু ছত্রী-সৈন্যরাও ব্যর্থ হল। তারা বন্দী হল ভারতীয় পুলিশবাহিনী ও সেনাবাহিনীর হাতে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পৌঁছে গেল ইছগিল খালের পাড়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিতস্তা থেকে ইরাবতী পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল লম্বা এই ইছগিল। চওড়ায় ১২০ ফুট আর ১৫ ফুট গভীর।
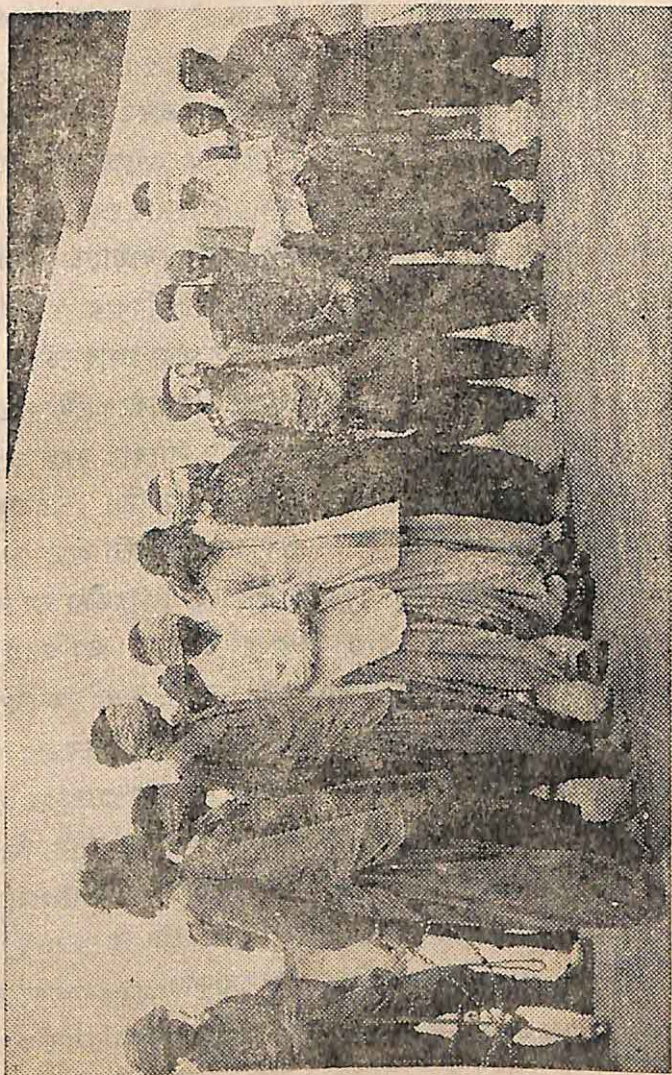
বন্দী অবস্থায় পাকিস্তানী ছত্রী সৈন্য

৭ই সেপ্টেম্বর—ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে চলল নানা বাধা অতিক্রম করে শিয়ালকোটের দিকে এবং কচ্ছ সীমান্তে।

৮ই সেপ্টেম্বর—গাদ্‌রা শহরের পতন হল ভারতীয় সেনাদের হাতে। প্রচণ্ড সংগ্রামে শত শত প্যাটন ট্যাঙ্ক এবং স্যেবার জেট্ চুরমার হয়ে গেল। আর কতক এল ভারতীয় বাহিনীর দখলে। কি স্থলে, কি অন্তরীক্ষে কোথাও পাকিস্তানী ফৌজ দাঁড়াতে পারল না রণকুশলী ভারত-সেনাদের সম্মুখে। ভারতীয় বিমান বাহিনী বোমা ফেললো চাকলালা, সারগোদা, পেশোয়ার এবং কোহাটে। বহু বিবর-ঘাঁটি এবং র‍্যাডার চূর্ণবিচূর্ণ হল। লাহোর শিয়ালকোটের পতন হল অনিবার্য। পাকিস্তান মনে করল ভারত লাহোর দখল করে নেবে। কিন্তু ভারত পাকিস্তান বিজয়ে অবতীর্ণ হয় নি। পররাজ্য জবরদখল করাও ভারতের নীতি নয়। শুধু নিজের ঘাঁটি হতে শত্রু বিতাড়নের জন্য শত্রুর ঘরে হানা দিয়েছে ভারতীয় ফৌজ, তার উদ্দেশ্য পাকিস্তানের সমরশক্তি নষ্ট করে দেওয়া। হাজি পীর গিরিবর্ত এবং উড়ি-পুঞ্চ এল ভারতীয় দখলে। স্থলে, অন্তরীক্ষে কোন রকম সুবিধা না হওয়ায় পাক নৌ-বাহিনী দ্বারকাবন্দরে গিয়ে গোলা-বর্ষণ করে। কিন্তু ভারতীয় নৌ-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করতেই তারা পিছনে হটে যায়। এবারে পাকিস্তান তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাহোর রণাঙ্গনে। কাসুর থেকে পাক-বাহিনী সমানে এগিয়ে আসতে লাগল। ভারতীয় ফৌজ কিছুটা হটে এল খেমকরণের পেছনের দিকে। সেখানে ভারতীয় ফৌজ ঘোড়ার খুরের আকারের মত ব্যূহ রচনা করে অপেক্ষা করতে লাগল পাকিস্তান-বাহিনীর জন্য। পাকিস্তান বাহিনী মনে করল ভারতীয় বাহিনী তাদের দূর্বার গতির

সম্মুখে দাঁড়াতে পারছে না। তারা প্রবল বিক্রমে পাঁচটি সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ছুটে এল।

৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর—খেমকরণে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। তিনদিক থেকে ঘিরে ধরল ভারতীয় সেনাদল—পাকিস্তান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হল। পর পর প্যাটন ট্যাঙ্ক মারা পড়তে লাগল। একা আব্দুল হামিদই চারখানা ট্যাঙ্ক বিনাশ করল। পাকিস্তান বাহিনীর তখন কোন দিকেই হটবার সুযোগ ছিল না। চারিদিকে শুধু মৃত্যুর হাহাকার।

সেদিন সবশুদ্ধ ট্যাঙ্ক মারা পড়েছিল ৯৭ খানা। তার মধ্যে প্যাটনের সংখ্যাই অধিক। ৯ খানা ট্যাঙ্ক অক্ষত অবস্থায় ধৃত হয়। ২ খানা গোলন্দাজ সিপাহী সহ বন্দী হয়। ঐদিন বহু পাকিস্তানী অফিসার ও বিপুল সংখ্যক সেনা ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ক্ষেমকরণ প্যাটন ট্যাঙ্কের মহাসমাধিতে পরিণত হয়। এই প্যাটন ট্যাঙ্কের মহাশ্মশান খেমকরণের নাম দেওয়া হয়েছে **প্যাটন নগর**। বহু বিদেশী সমর বিশেষজ্ঞ মার্কিন প্যাটন-ট্যাঙ্কের সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করতে আসেন। বারকি সহরেরও পতন হল। বারকি ইছগিল খালের পাড়ে—লাহোর থেকে কয়েক মাইল দূরে। আর ডোগরাইও লাহোর থেকে মাত্র ৮ মাইল দূরে। ডোগরাইও এল ভারতীয়-সেনাদের দখলে। পশ্চিমী সংবাদপত্র পক্ষপাতিত্বের সুরে প্রচার করেছিল, ৩ জন ভারতীয় জোয়ান একজন পাকিস্তানী সেনার সমান। সেই নির্লজ্জ বন্ধুরাই দেখল যে, একজন ভারতীয় জোয়ানই একজন পাকিস্তানী সেনার পক্ষে যথেষ্ট।

পাকিস্তান যুদ্ধের গতি অন্যদিকে নেওয়ার জন্য শুরু করল
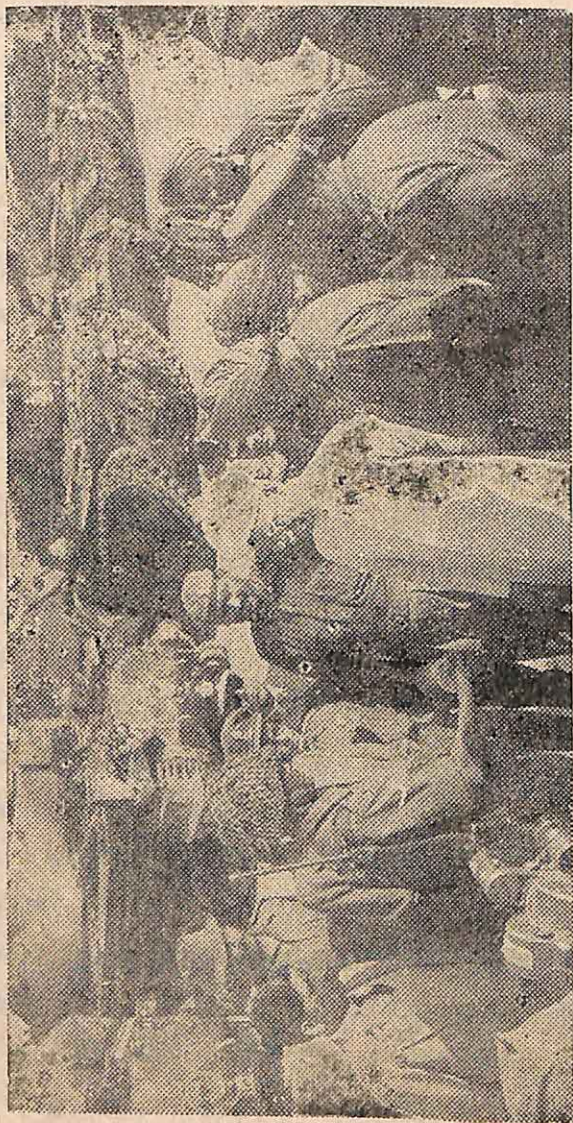
খেমকারণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিদর্শনরত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

পূর্বখণ্ডে আক্রমণ। কলাইকুণ্ডা, ব্যারাকপুর, বাগডোগরা, আগরতলায় করল বোমাবর্ষণ। কুচবিহার সীমান্তে গীতালদহে গোলাগুলী চালাতে শুরু করল। যখনই ভারতবাহিনীর কামান গর্জে উঠল তখনই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। পূর্বখণ্ডে যুদ্ধবিস্তারের চেষ্টা করা সত্বেও পাকিস্তান ভারতকে যুদ্ধে নাবাতে পারে নি। কারণ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী পূর্বখণ্ডে যাতে যুদ্ধবিস্তার না করে তার জন্য সমরনায়কদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইদিন চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই ভারত পাকিস্তানের উপর সশস্ত্র বিরাট আক্রমণ চালিয়েছে বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর—লাহোরখণ্ডে পাকিস্তান বাহিনীর প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে পড়ে এবং বহু অফিসার ও পাকিস্তান সেনা আত্মসমর্পণ করে। একজন মেজর জেনারেল এবং একজন বিগ্রেডিয়ার কমাণ্ডার নিহত হলে পাকিস্তান ফৌজেরা পালাতে শুরু করে। ঐদিন ফিলোরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে আসে।

১২ই সেপ্টেম্বর—নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল সেক্রেটারী উ-থান্ট্ ও প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় ভারত সর্বদাই রাজী আছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—সকল রণাঙ্গনে ভারতীয় সেনাবাহিনী কঠিন পাক-প্রতিরোধ চূর্ণ করে দেয়। মজঃফরাবাদ রেল সড়কের নিকট দুটি ঘাঁটি ভারতীয় বাহিনীর দখলে আসে।

১৪ই সেপ্টেম্বর—পাক-বিমানবাহিনী পশ্চিমবঙ্গে ব্যারাকপুর বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে। ঐদিন ভারতীয় বিমানবহর

পাকিস্তান সীমান্ত থেকে তিন'শ মাইল ভিতরে উড়ে গিয়ে একটি পাক-বিমানঘাঁটি ধ্বংস করে। পেশোয়ার ও কোহাটে বিমানঘাঁটির উপর হানা দিয়ে প্রভূত ক্ষতি করে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—ভাতীয়-বাহিনী শিয়ালকোট-পাস্‌রুর রেল পথটি দখলে আনে। এই অঞ্চলের প্রচণ্ড সংগ্রামে পাকিস্তান ৮৫টি প্যাটন ট্যাঙ্ক হারায়।

১৬ই সেপ্টেম্বর—চীন যখন দেখল বন্ধু পাকিস্তানের বিপদ আসন্ন তখন ভারতকে পাঠাল এক চরমপত্র। মেয়াদ ৩ দিনের। ভারত নাকি নাথুলা-গিরিপথ সীমান্তে নানারকম সাজসরঞ্জাম ও যুদ্ধোপকরণ সমাবেশ করেছে। ওগুলি ৩ দিনের ভিতরে সরিয়ে আনতে হবে, নইলে চরম ফল পেতে হবে। ৩ দিনের পরে আরো ৩ দিন সময় বাড়ান হল। ভারত চীনের কাছে মাথা নত না করে তার সঙ্গে লড়তে রাজী দেখে চীন নিজেই চরমপত্র প্রত্যাহার করল।

রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে ছুটে এল সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্‌ট্। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিলেন তিনি। ভারত প্রথম থেকেই সে প্রস্তাব মেনে নিল। কারণ ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে চায় নি এবং পাকিস্তান দখল করতেও চায় নি। ভারত শুধু চেয়েছিল পাকিস্তানের রণসাধ মিটিয়ে দিতে—সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়েছে। কারণ পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

২৩শে সেপ্টেম্বর—যুদ্ধবিরতি কার্যকর হল। কিন্তু ঐ তারিখের পূর্বেই ৭৫০ বর্গমাইল এলাকা আমাদের দখলে এসেছে আর পাকিস্তানের দখলে গিয়েছে মাত্র ২১০ বর্গমাইল। বাইশ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিরতি ঘটল। চীন জানতে পারল ১৯৬২ সালের

ভারতবর্ষ আর ১৯৬৫ সালের ভারতবর্ষ এক নয়। যুদ্ধ বিরতির পরে দেখা গেল, পাক-কাশ্মীর থেকে রাজস্থান পর্যন্ত সর্বত্র পাক-জমিতে ভারতীয় পতাকা উড়ছে। শুধু ছামব্-জাউড়িয়ানে একটি থানা আর খেমকারণে একফালি জমি পাকিস্তানের দখলে। ইছগিল খালের পূর্বতীরে সমস্ত জমি ভারতের দখলে এবং আলহার রেল ষ্টেশনটিতে ভারতের পতাকা। ভারত আজ বিজয়ী। ভারত-পাক যুদ্ধে পাকসৈন্য নিহত হয় ছয় হাজার একশ চারজন। পাকিস্তান ট্যাঙ্ক হারিয়েছে দু'শো পঁয়তাল্লিশখানা, প্যাটন ট্যাঙ্ক সমেত চারশত একাত্তর খানা। ভারত ট্যাঙ্ক হারিয়েছে একশত আঠাশখানা আর যোদ্ধা হারিয়েছে দু'হাজার চার'শ অষ্টাশী জন। বিমান ক্ষয় হয়েছে ভারতের আঠাশখানা এবং পাকিস্তানের তেয়াত্তরখানা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "জাতির জীবনকে জাগ্রত করে তুলতে হলে ব্যক্তিকে জীবন বিসর্জন দিতে হবেই। ভারতবাসী যাতে বাঁচতে পারে তাঁদের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি লাভের পথ যাতে সুগম হয় সেই জন্যই আমি মৃত্যু বরণ করে নেবো।...অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করে চলার মত ঘৃণ্য পাপ আর কিছু নেই।"

ভারতীয় তরুণদল নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশমাতার জন্য জীবনদান করে জাতির জীবনকে গৌরবান্বিত করেছেন। সমস্ত জাতির শ্রদ্ধা, নমস্কার নিবেদিত হ'ক তাদের উদ্দেশ্যে। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগ ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। শহীদদের পরিবারসমূহের শোক ও বেদনা সমস্ত ভারতবাসীর শোক

ও বেদনা। ভারত সরকার শহীদদের পরিবারবর্গের অবৈতনিক শিক্ষা ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন।

ভি. এস. সোমান্

ভারতের নৌবাহিনীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন ভাস্কর সদাশিব সোমান্। ১৯৬২ সালের ৫ই জুন ভারত সরকার তাঁকে নৌবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ সোমান্ গোয়ালিয়রে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর আই. এম. এম. টি. এস. (ডাফ্রিন) ট্রেনিং সমাপ্ত করেন বেল্জিয়ামে। এই শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর আর. আই. এম. ট্রেনিংয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডে আড়াই বছর অতিবাহিত করেন এবং শিক্ষা সমাপ্তির পরে ভারতে ফিরে আসেন। তিনি ১৯৩৪ সালে সাব্ লেফ্ট্যানান্ট, ১৯৩৭ সালে লেফ্ট্যানান্ট, ১৯৪৫ সালে লেফ্ ট্যানান্ট কম্যাণ্ডার, ১৯৪৬ সালে এ্যাক্টিং কম্যাণ্ডার, ১৯৪৭ সালে এ্যাক্টিং ক্যাপ্টেন, ১৯৫৮ সালের ২রা জুন তিনি রিয়ার অ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হন। ভারত তাঁকে নৌ-বাহিনীর

ভাইস্ এ্যাডমিরাল সোমান

সর্বাধ্যক্ষের পদে বরণ করে তাঁর যোগ্যতাকেই স্বীকৃতি দান করেছেন। ভাইস এ্যাডমিরাল সোমান ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী নৌ-সেনাধ্যক্ষ হিসাবে ভাইস এ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জী ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। ভাইস অ্যাড-মিরাল শ্রীচ্যাটার্জী জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজের কম্যাণ্ডাণ্ট রূপে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতীয় নৌবহরের ফ্লাগ অফিসার ছিলেন এবং এর আগে তিনি নৌ-সেনানীদের উপাধ্যক্ষ ছিলেন।

ভাইস এ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জী

এয়ার মার্শাল অর্জন সিং

তখকার যুদ্ধে ভারতের বিমান বাহিনীর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। এই বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল অর্জন সিং। আজ বিমান শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্র যে সমীহ করে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কারণ বিপক্ষের গুরুতর ক্ষতি সাধন করতে বিমান বাহিনীই সক্ষম। শুধু শত্রুঘাঁটির উপরে বোমা বা মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপের মধ্যেই বিমান বাহিনীর কার্য সীমাবদ্ধ নয়। সামরিক ব্যবস্থা চালু রাখা, খাদ্য ও সমরসম্ভার বহনের ব্যাপারে বিমান আজ সভ্য জগতের অপরিহার্য অঙ্গ। অর্জন সিং-এর পরিচালনার দক্ষতা

গুণেই দুর্ধর্ষ স্যাবার জেট বিমানকে ন্যাট দ্বারা বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এয়ার মার্শাল অর্জন সিং ভারতের বিমান যুদ্ধের ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তিনি লায়ালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে তিনি লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্তি হন। ইংল্যাণ্ডে ব্ল্যাক নেল ষ্টাফ কলেজ থেকে তিনি বিমান পরিচালন বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কমিশনড্ র‍্যাঙ্কে উন্নীত হন। ১৯৪২ সালে ফ্লাইং অফিসার, ১৯৪৬ সালে উয়িং কম্যাণ্ডার, ১৯৪৭ সালে গ্রুপ ক্যাপ্টেন, ১৯৬০ সালে এয়ার ভাইস মার্শাল, ১৯৬৩ সালে ডেপুটী চীফ এয়ার ষ্টাফ এবং ১৯৬৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ভাইস চীফ এয়ার ষ্টাফের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাঙ্কের সমাধি রচনাতে এয়ার মার্শাল অর্জন সিংয়ের কৃতিত্ব কম নয়। অর্জন সিংও 'পদ্ম-বিভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন।

পাকিস্তান যুদ্ধে নেমেছিল আমেরিকার কাছ থেকে খয়রাতি পাওয়া শক্তিশালী এফ-৮৬ স্যেবার জেট্ আর এফ-১০৪ ষ্টার ফাইটার বিমান নিয়ে, আর ভারত নেমেছিল তার নিজের তৈরী ন্যাট্ এবং নগদ মূল্যে কেনা হাণ্টার আর মিষ্টিয়ার নিয়ে—তবু পাকিস্তান পরাস্ত হল। তার কারণ পাকিস্তানের বৈমানিকগণ ছিল অপটু আর ভারতের বৈমানিকগণ সুশিক্ষিত এবং সাহসী। এখন আমাদের দেশে এই ন্যাট্ বিমান তৈরী হচ্ছে। স্যেবার জেট এখনও ক্যানাডা আর অষ্ট্রেলিয়ায় তৈরী হচ্ছে। ভারতীয় বিমান বহরের

প্রাক্তন এয়ার মার্শাল অর্জন সিং

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মিগ-২১ও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ভারতেও মিগ বিমান তৈরী হচ্ছে। নাসিক এবং কোরাপুট ফ্যাক্টরী হতে ১৯৬৮ সনের মে মাসে প্রথম মিগ এঞ্জিন তৈয়ারীর কাজ শেষ হয়।

জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী

পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর সাঁজোয়া বাহিনী যে অধিনায়কের সামরিক রণনীতির দ্বারা বিধ্বস্ত, সেই জয়ন্তনাথ চৌধুরীর প্রতি ভারতীয় জনগণের কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নেই। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধ তাঁহার অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও কুশলতায় যে প্রতিহত হয়েছে তার জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র শ্রদ্ধানত চিত্তে প্রশংসা করেছে তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভার। তাঁর পিতার নাম ৺অমিয়নাথ চৌধুরী ও মাতার নাম প্রমিলা দেবী। চৌধুরীর পিতা একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং মাতা প্রমীলা দেবী জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি দেশবরেণ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। এই পরিবারের খ্যাতি শুধু মসিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না অসিতেও স্মরণীয়। বাসস্থান ছিল পাবনা জিলার হরিপুরে। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি যান বিলেতে। সেখানে তিনি হাইগেট স্কুলে শিক্ষা নেন এবং কমিশন পেয়ে রয়াল মিলিটারী কলেজে সামরিক শিক্ষা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে সপ্তম ক্যাভালরিতে তাঁর সামরিক জীবন শুরু করেন। ১৯৪০ সালে ভারতীয় পঞ্চম ডিভিসন নিয়ে তিনি আবিসিনিয়া, ইরিত্রিয়া ও সুদানে যান। ১৯৪৩ সালে জয়ন্তনাথ স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি অধিকাংশ দেশেরই সামরিক কলাকৌশলের সাথে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪৬

সালে মালয়ে তিনি ব্রিগেডিয়ার হন। ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি হলেন মেজর জেনারেল। দেশদ্রোহীতার হাত থেকে জেনারেল চৌধুরী হায়দ্রাবাদ ফিরিয়ে আনলেন। হায়দ্রাবাদে বিদ্রোহী রাজাকরদের বিরুদ্ধে পুলিশ অ্যাকশন চালিয়ে ভারতকে তিনি সংকট মুক্ত করলেন। সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খ্যাতি। জয়ন্তনাথ হায়দ্রাবাদের সামরিক রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন।

জেনারেল জয়ন্তনাথ চোধুরী

১৯৫২ সালে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হয়ে দিল্লীতে গেলেন। ১৯৫৩ সালে চীফ্ অফ্ দি জেনারেল ষ্টাফ্ এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সামরিক বিভাগের প্রধান। গোয়া অভিজানের সফলতা তাঁকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের শেষ দিকে তিনি ছিলেন সৈন্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ১৯৬৫ সালে ভারতের পশ্চিমাংশ আক্রান্ত হলে গর্জে উঠলেন তিনি। পাক্-ভারত যুদ্ধের দুর্জয় প্যাটন ট্যাঙ্কের মহাসমাধি রচনার সমর কুশলী নায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধরী। ছয়জন বিশ্ব সমরনায়ক ট্যাঙ্কযুদ্ধ বিশারদদের মধ্যে জেরারেল চৌধুরী একজন। জয়ন্ত চৌধুরীর বীরত্বে রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এই সেনা নায়ককে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছেন।

জেনারেল জে. এন. চৌধুরী ১০ই জুন (১৯৬৬) তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং আর্মি চীফ্ অব ষ্টাফ পদে উন্নীত হয়েছিলেন ভাইস চীফ অব ষ্টাফ লেঃ জেঃ পি. পি. কুমারমঙ্গলম।

॥ তপনকুমার চৌধুরী ॥

লাহোর ও শিয়ালকোট রণাঙ্গনে আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন তপনকুমার চৌধুরী। তপনকুমারের পিতার নাম রামচন্দ্র চৌধুরী। কলিকাতায় ১৪৪-কে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে বাড়ী। বাল্যবয়সে তপন চৌধুরী একজন সু-অভিনেতা ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তপন চৌধুরী ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে গ্র্যাজুয়েট হলেন। এর পরে তপনকুমার ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে পাইলট অফিসার, ফ্লাইং অফিসার ও পরে লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যাণ্ট তপনকুমার লাহোর রণাঙ্গনে আত্মাহুতি দেন। মৃত্যু সংবাদে তপনের পিতা শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন "আমি আমার পুত্রের জন্য অত্যন্ত গর্বিত। সে তার কর্তব্য সম্পন্ন করেছে। দেশ ও জাতির জন্য সে গৌরবময় মৃত্যুবরণ করেছে।"

তপনকুমার

তপনকুমারের ছেলেবেলাকার নাম ছিল মিন্টু। ছোটবেলা

থেকেই মিনুর অভিনয় করার ঝোঁক ছিল। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মিনু শিশিরকুমার ভাহুড়ীর সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করেছে। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীই হয় তার শেষ অভিনয়। তার অভিনয় প্রতিভা দেখে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাহুড়ী বলেছিলেন, "এ যে দেখছি ঈগল, তেজী ঈগল, এ অনেক উঁচুতে উঠবে।" সেই তপন চৌধুরী সত্যিই জেট ফাইটারের সওয়ার হয়ে অনেক উঁচুতেই উঠেছিল। বাল্যকাল থেকেই সকল বিষয়ে তপন কুমার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ছোটাবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল যে সে হবে একজন বিশেষ মহাকাশচারী এবং ঐ জন্য রাশিয়া যাচ্ছিল ট্রেনিং নিতে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ট্রেনিং নেওয়ার জন্য মস্কো যাচ্ছে এই বলে তপনকুমার বাবাকে চিঠি দিয়েছিল। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই চিঠি এলো শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। সুতরাং মস্কো যাওয়া হলো না। বাবাকে কালীঘাটে পূজো দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল।

৫ই সেপ্টেম্বর থেকেই তপনকুমারের লড়াই শুরু হল। স্কোয়াড্রন লিডার জানালেন—ছামব্ এলাকায় শত্রুরা বহু সংখ্যক প্যাটন ট্যাঙ্ক, ভারী ভারী কামান, বহু সাঁজোয়া গাড়ী এবং হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করেছে। স্কোয়াড্রন লিডারের অনুমতি নিয়ে তপনকুমার আকাশে উড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আরো বহু প্লেন তাঁকে অনুসরণ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দুর্বার বেগে পাকিস্তানের প্যাটন ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী ও হাজার হাজার সৈন্যের উপর বোমা ফেলে, রকেট ফেলে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বিজয়ী বীর নিজের ঘাঁটিতে ফিরে এলো।

তপন কুমারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল জীবন দিয়েও শত্রুদের প্রতিহত করে ভারতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবে। তাই তিনি নিরলস ভাবে লড়াই করে যেতে লাগলেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান আরো ভীষণভাবে আক্রমণ করল। তপনকুমার পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে গিয়ে পাকিস্তান ঘাঁটিগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে লাগলেন। এই ভাবে বহুপ্যাটন ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী ভারী ভারী কামান নষ্ট করে যখন ফিরে আসছিল তখন পাকিস্তানের একটি গোলা চৌধুরীর প্লেনকে আঘাত করে এবং তাঁর বিমানখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইচ্ছে করলে প্যারাস্যুটে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে পারতেন কিন্তু বিমানখানি হারাতে হ'ত। একখানা বিমান নষ্ট হওয়া মানে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হওয়া। বিমান খানাকে ভারতের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করলেন। ভারতের মাটিতে পৌঁছে তাড়াতাড়ি নাবাতে পারলেন না। কারণ সেখানে লোকালয় রয়েছে ; বিস্ফোরণ ঘটলে বহু বেসামরিক লোকের প্রাণহানি হবে। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘাঁটিতেই তিনি ফিরে এলেন এবং তার বিমানে যে বিস্ফোরণ ঘটল তাতে কেবল তপনকুমারই প্রাণ হারালেন। সামরিক মর্যাদা সহকারে তপনকুমারের মৃতদেহ কলকাতায় পাঠান হল। সমস্ত কলকাতা শোকে ভেঙ্গে পড়ল। বিরাট শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল কেওড়াতলা শ্মশানে। কলকাতার আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। তপত কুমারের নশ্বর দেহ ছাই হয়ে গেল। কিন্তু তার অমর আত্মা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক হয়ে থাকল।

মেজর ভাস্কর রায়

পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর যে সব বীর জোয়ানরা বজ্রের মত কঠোর সাহসের সঙ্গে জীবন তুচ্ছ করে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল—ভাস্কর রায় তাদেরই একজন। ছামব্ এর লড়াইয়ে ভাস্কর রায় যে রণ-কৌশল দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। ভাস্করের পিতার নাম শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায়। দিল্লীর পুসা রোডে তাঁর বাড়ি। ভাস্করের স্ত্রীর নাম নীতা রায়। ভাস্কর ডুন কলেজ থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে দেশরক্ষা একাডেমীতে পড়তে যান। সেখানেও তিন বিশেষ দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

মেজর ভাস্কর রায়

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় মেজর ভাস্কর রায় তার রাজপুত স্কোয়াড্রন নিয়ে সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রিতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান বাহিনী পঙ্গপালের মত ভারত ভূমিতে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে ছিল ৭০ খানা প্যাটন ট্যাঙ্ক, বহু সাজোঁয়া গাড়ী এবং বহু ভারী কামান। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য মেজর ভাস্কর রায় মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ভাস্কর রায়ের কাছে তখন মাত্র ১৩টি এ. এম. এক্স ট্যাঙ্ক। পাকিস্তান

বাহিনীর কাছে ইহা অতীব নগণ্য। কিন্তু উনত্রিশ বছরের ভাস্কর রায় এই কঠোর পরীক্ষা কি ভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থির করে ফেল্লেন। দিল্লী অভিমুখী এই প্যাটন ট্যাঙ্ক বাহিনীকে যে ভাবেই হোক প্রতিহত করতেই হবে—এই ছিল তার সংকল্প। স্থির মস্তিষ্কে তিনি তেরটি ট্যাঙ্ক ও সৈন্য বাহিনীকে নিয়ে রচনা করলেন একটি দুর্ভেদ্য ব্যূহ। অধীনস্থ সেনা বাহিনীকে হুসিয়ার করে দিলেন, আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন গোলাগুলী না ছোড়ে। রাজপুত স্কোয়াড্রন নিয়ে বাজরার খেতের মধ্যে আত্মগোপন করে অপেক্ষায় রইলের পাকিস্তান বাহিনীর।

পাকিস্তান বাহিনী যখন দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে এল ভাস্কর রায়ের একশ গজের মধ্যে, তখন দীপ্ত ও বজ্র কণ্ঠে ঘোষিত হল—'ফায়ার'। একই সঙ্গে গর্জে উঠল তের খানা ট্যাঙ্কের কামান। রাজপুত সৈন্যরাও প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তান বাহিনীর উপর। পাকিস্তান বাহিনী প্রথমে বাধা পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারা ভাবল ভারতীয় বাহিনী প্রকাণ্ড শক্তি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে। তৎক্ষণাৎ তারা অনেকটা পিছু হটে গেল। তারপর শুরু করল মার্কিনী অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা প্রচণ্ড সংগ্রাম। রাজপুত বাহিনী তাদের প্রতিহত করার জন্য দুর্ধর্ষ লড়াই করতে লাগল। মেজর ভাস্কর রায় জীপ গাড়ীতে চড়ে সৈন্যদের বুদ্ধি, সাহস ও প্রেরণা যোগাতে লাগলেন। তার মুখে শুধু এক শব্দ শোনা যাচ্ছিল, 'আঘাত কর—এগিয়ে চলো'।

গাঢ় ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল চতুর্দিক। কিছু সময় পরে মেজর রায়কে আর দেখতে না পেয়ে তার সহকারী অনুসন্ধানে বেড়িয়ে গেল।

কিছুদূর এগিয়ে দেখতে পেল ভাস্কর রায় গোলন্দাজের কাজে নিযুক্ত আছেন। তার সহকারীকে দেখতে পেয়েই চীৎকার করে উঠলেন, “তুমি জোয়ানদের কাছে ফিরে যাও, এদিকে এসেছ কেন?” মেজর ভাস্কর রায় পরের দিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ও ট্যাঙ্ক নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে প্রতিহত করে রাখে। পাঁচটার পরে আমাদের বিমান বাহিনী এসে স্থল বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে আসে। দুদিন দুরাত্রি ভাস্কর রায় তাঁর রাজপুত বাহিনী নিয়ে বিরামহীন যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর বহু সৈন্য ও ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। ছামব্ এর যুদ্ধের নায়ক ভাস্কর রায় যখন ফিরে আসছিলেন, তখন পাকিস্তানের একটা গোলা তার ট্যাঙ্কটির উপর এসে পড়ে। একটি গোলন্দাজ মারা যান এবং ড্রাইভারের একখানা হাত উড়ে যায়; কিন্তু ভাস্কর রায় অক্ষত দেহে অন্য আর একটি ট্যাঙ্কে গিয়ে বসলেন।

রাত সাড়ে এগারটায় তারা নিজেদের বেস্ ক্যাম্পে ফিরে এলেন। ভাস্কর রায় নিজের জীবন তুচ্ছ করে আপন কর্তব্যবোধের দুর্জয় সংকল্প দেখিয়েছেন।

তার ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠার তুলনা হয় না। ভাস্কর যখন সীমান্তে নিযুক্ত ছিলেন, তার স্ত্রী নীতাও অলসভাবে ঘরে বসে ছিলেন না। তিনিও তার শিশু সন্তানটিকে ভাস্করের মায়ের কাছে রেখে রেডক্রসের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ভারত সরকার মেজর ভাস্কর রায়কে ‘মহাবীর চক্র’ দিয়ে ভূষিত করেছেন। সকল ভারতবাসী মেজর রায়ের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করে।

ভাস্কর গুহ রায়

পাক-ভারত যুদ্ধে বীরের মত প্রাণ দিলেন ভাস্কর গুহ রায়। বরিশাল জিলার শ্রীরবি গুহরায়ের পুত্র ভাস্কর। বড় হয়েছেন কুয়ালালামপুরে (মালয়েশীয়া)। তিনি ১৯৬১ সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৬৪ সালে জেট্ বিমানের বৈমানিক হন। ১৯৬৫ সালে এপ্রিল মাসে তিনি ফিরে আসেন আমেরিকা হতে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ ক'রে। পাক-ভারত যুদ্ধে পশ্চিম সীমান্তে ভাস্কর গুহ রায় অসীম সাহসের পরিচয় দিলেন।

ছামব্ এলাকায় পাক সৈন্য ভারতীয় ঘাঁটির উপরে আক্রমণ চালায় বহু ট্যাঙ্ক সঙ্গে নিয়ে। তাদের আক্রমণ তিনি ব্যর্থ করে দিলেন বটে কিন্তু পরে লেফট্যানেণ্ট গুহরায়কে ৭ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করতে হল।

সূর্য যেমন চির-ভাস্বর, বাংলার বিমান যোদ্ধা বীর ভাস্করও তেমনি আমাদের হৃদয়ে চির-ভাস্বর হয়ে থাকবেন তাঁর আত্মোৎ-সর্গের জন্য।

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

পাক-ভারত যুদ্ধের আর এক বীর **অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়**। ১৯৪২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর অভিজিতের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়। অভিজিৎ-এর কাকা শ্রীশিবদাস চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্টশিক্ষা ব্রতী এবং সমাজসেবী। পিতার নির্দেশে অভিজিৎ দেশের এই

দুর্দিনে জরুরী কমিশনে যোগ দেন। আশুতোষ কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে তাঁহার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। ১৯৬২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হন। চীনের হামলা শেষ না হতেই পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করল। তরুণ যোদ্ধা অভিজিৎ এই যুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমিত শৌর্যে পাকিস্তান বাহিনীকে দুর্বার গতিতে তাড়িয়ে নিয়ে চললেন কাশ্মীরের কার্গিল থেকে। ১৯শে সেপ্টেম্বর জয় যখন সুনিশ্চিত সেই সময় শত্রুগোলার আঘাতে তাঁহার দেহ লুটিয়ে পড়ল। ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জয়ন্ত চৌধুরী বলেছিলেন, "ভারতীয় সৈন্যবাহিনী থেকে এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসে পড়ল।" বীরের প্রাণদান ব্যর্থ হয় না ; ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় অভিজিৎ প্রাণ উৎসর্গ করে অমর হয়ে রইলেন। ভারতবাসী মাত্রই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল স্মরণ রাখবে।

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

হাবিলদার আবদুল হামিদ

আর এক বীর সন্তান পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করার সংগ্রামে প্রাণদান করে শহীদ হয়েছেন। তাঁর নাম হামিদ। বীর হামিদ মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। হামিদ

উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই গাজীপুর জিলার ধরমপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুদক্ষ শিকারীও ছিলেন। লাঠি-খেলা ও কুস্তিতে তার সমকক্ষ কেহ ছিল না। হামিদের প্রধান পরিচয় তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা।
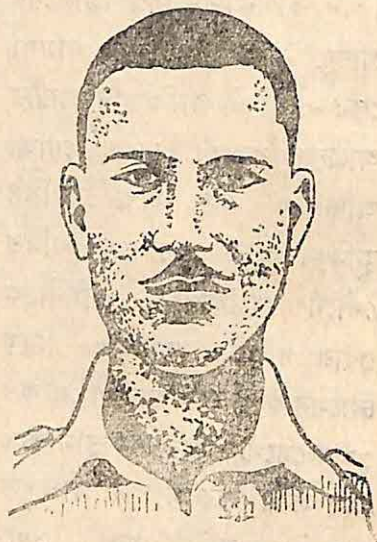
আবদুল হামিদ

১৯৬৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ট্যাঙ্কবাহিনী সকাল বেলাতেই ব্যাপক আক্রমণ সুরু করে। তাদের কামান হতে বৃষ্টি-ধারার মত গোলাগুলী নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করল। সাহসী বীর এগিয়ে চললেন শত্রুসৈন্যের দিকে। হামিদের রণকৌশলে অল্পক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানের প্যাটন ট্যাঙ্ক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পাকিস্তানী গোলাবর্ষণ তাঁর গতি স্তব্ধ করতে পারল না। তিনি এগিয়ে চললেন। এই সময়েই শত্রুর মেশিনগানের গুলী তাঁহার দেহ বিদ্ধ করে। নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করেও মুমূর্ষু হামিদ মৃত্যুর পূর্বেও আর একটি প্যাটন ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেন। বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু ভারতমাতার বীর-সন্তান হামিদ লাভ করলেন। তাঁহার এই আত্মত্যাগ ভারতবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। হামিদ নিজের প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান

নির্বিশেষের পবিত্র জন্মভূমি। ভারত সরকার হামিদকে "পরম বীরচক্র" দিয়ে তার যোগ্য সম্মান দিয়েছেন।

ভারতীয় গ্রেনেডিয়ার বাহিনীর হাবিলদার আব্দুল হামিদ যিনি ৩টি প্যাটন ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে ৪র্থটি ধ্বংসের চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছেন, তাঁকে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দিয়েছিল ধর্ম নয়, পবিত্র দেশপ্রেম। হাবিলদার আবদুল হামিদ জানতেন যে এই ট্যাঙ্ক যদি পার পায় তো সে কলুষিত করবে তাঁর দেশের মাটি। তাঁর গাঁ জ্বলবে, তাঁর বাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হবে, তাঁর ছেলে-বৌ লাঞ্ছিত হবে, যেমনভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে কাশ্মীরে তাঁর সাথী ও সহ-যোদ্ধাদের ছেলে-বৌ রা। সেখানে হানাদারেরা মুসলিম বলে তাদের রেয়াৎ করে নি।

প্রবাল রায়

আর এক বীর জোয়ান **ক্যাপ্টেন প্রবাল রায়**। কোন এক গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানী ঘাঁটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন তিনি পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তখন পাকিস্তানের আকস্মিক গোলাবর্ষণের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পিতার নাম নীরোদকুমার রায়—ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক। কয়েক বছর আগে তিনি দেহ-ত্যাগ করেছেন। মাতা শ্রীমতী বাসন্তী রায়। দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৭২।৩৮ রসা রোডে প্রবাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন গ্রাজুয়েট। ১৯৫৫ সালে দেরাদুন মিলিটারী কলেজে তিনি যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি সেকেণ্ড লেফ্‌ট্যানেন্ট' হন। সামরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার পর তিনি জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে কর্তব্যরত ছিলেন। ভারতের উত্তর সীমান্তে

যখন চৈনিক আক্রমণ শুরু হয় তখন তিনি বীরত্বের সঙ্গে শত্রুসৈন্য প্রতিহত করেন। পাক-ভারত যুদ্ধে শত্রু নিধন যজ্ঞের প্রধান হোতা হবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। ভারতীয় অভিযান যখন সাফল্যের পথে, তখন শত্রুসৈন্যের গোলায় তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন।

অসিত কুমার ঘোষ

আর এক ভারত জোয়ান স্কোয়াড্রন লীডার অসিত কুমার ঘোষ। ভারতমাতার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন, তা প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অসিত কুমার লক্ষ্ণৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্নাতক পরীক্ষায়. উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগ-দান করেন। হাণ্টার বিমান চালনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। চৈনিক আক্রমণের সময় অসিতকুমার নেফা রণাঙ্গনে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। গত পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম বিক্রমে তিনি পাক আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেন।

অসিত ঘোষ

আত্মোস্বর্গীয় বাঙ্গালী বীর জোয়ান
ইন্দ্রলাল রায়

ভারতের যেসব বীর-জোয়ান আত্মোৎস্বর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালী বীর ইন্দ্রলাল রায়ের নাম স্মরণীয়। ১৯১৮ সালে ফ্রান্সের আকাশে বিমানযুদ্ধে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন। দক্ষিণ কলিকাতায় ইন্দ্রলাল রায় রোড্ তাঁর ঐ স্মৃতির স্বাক্ষর। তিনিই প্রথম ভারতীয় বৈমানিক 'ডিষ্টিনগুইস্ড ফ্লাইং ক্রস' প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রলালের পথ অনুসরণ করেছেন আরও অনেক বাঙালী বিমান যোদ্ধা। "বাঙালী মসির যত ভক্ত, অসির তত নয়" একথা বলেছিল বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু আজ আর বাঙালী সেকথা মেনে নিতে রাজী নয়। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বাঙালী বীরেরা।

ইন্দ্রলালের পরে **উইং কম্যাণ্ডার কে. কে. মজুমদার** দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধে ইংরেজ রণবিদদের মুগ্ধ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের সেরা বারজন বীরের মধ্যে বাঙালী বীর উইং কম্যাণ্ডার-কে. কে. মজুমদার একজন। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিমান দুর্ঘটনায় চিরবিদায় নেন বাংলার এই বীর সন্তান।

স্বাধীন ভারতে **এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী** প্রমাণ করেছেন—শুধু সেনানীর কাজে নয় অধিনায়কত্ব করবার যোগ্যতাও বাঙালীর আছে। মার্শাল মুখার্জীর দৃঢ় সংগঠন শক্তিতে ভারতীয় বিমান বাহিনী শক্তিশালী হয়েছে। সুব্রত মুখার্জীর আকস্মিক মৃত্যুর পর বিমান বাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন ভারত-গৌরব অর্জন সিং। **অর্জন সিংএর পরেই যাঁর নাম তিনি এয়ার ভাইস মার্শাল রঞ্জন দত্ত।** স্থলযুদ্ধেও

বাঙালী পিছিয়ে নেই, এই বাহিনীর অতি স্মরণীয় নাম **কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস**। পরাধীন ভারতে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি সেনাবাহিনীর এত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরে আরও অনেক বীর বাঙালী স্থলযুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, **পরেশ লাল রায়** তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আকাশ ও মেদিনীর দুই সেরা সৈনিক ইন্দ্রলাল ও পরেশলাল বরিশাল জেলার লাকুটিয়ার রায় বংশের দুই সহোদর। ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের সময় **লেফ্‌ট্যানেণ্ট কর্ণেল বিজয়মোহন ভট্টাচার্য** জীবনপণ যুদ্ধ করেছেন, পরে তিনি বন্দী হন। সম্প্রতি তিনি মহাবীর চক্রে ভূষিত। **বীরচক্রধারী সুবেদার ব্রজেন্দ্র চন্দ্র** বহু চীনা সৈন্য ঘায়েল করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দুই যোদ্ধাকে পুরস্কৃত করেছেন।

সরোজিনী নাইডু

প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে দেশ জেগে উঠল, স্বাধীনতার দুন্দুভি-নাদে ডাক এল দেশের সমস্ত মানুষের কাছে—দেশের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য পণ করতে তখন এগিয়ে এলেন এক মহীয়সী মহিলা। নাম শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু। তিনি ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামীর নাম ডাঃ এম. জি. নাইডু। তাঁর পিতা ছিলেন হায়দ্রাবাদ নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ। আদি নিবাস ছিল **ঢাকা বিক্রমপুরে**। পরে তিনি হায়দ্রাবাদে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

বীরেন্দ্রনাথ একজন বৈপ্লবিক নেতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথ একজন সুকবি এবং ভগ্নী সুনালিনীও ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিল্পী। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বোম্বাইয়ে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একজন অসামান্যা কবি ও লেখক ; তাঁহাকে ভারতের "বুলবুল" বলা হয়। সরোজিনী নাইডুর কবিত্ব শক্তির মতই ছিল তাঁর অসাধারণ বাক্‌শক্তি। তিনি দেশব্যাপী প্রচার করতে শুরু করলেন দেশের বাণী, আদর্শ ও দেশবাসীর কর্তব্য। তাঁর মত বক্তৃতার শক্তি অতি অল্প ভারতবাসীই প্রদর্শন করেছেন।

সরোজিনী নাইডু

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবার জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করেন। দেশ সেবার জন্য তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। প্রত্যেক বারই কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশের কাজে। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনেরও তিনি সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন দীর্ঘকাল দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ জাতীয় সরকার তাঁকে যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্রী মনোনীত করেন। এখানেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত অসামান্য কৃতিত্বের সাথে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতের গৌরব সরোজিনী নাইডু ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ দেহত্যাগ করেন। সমস্ত ভারতবাসী তাঁর মৃত্যুতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তাঁরই কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোচনাপ্রসঙ্গে **বিদ্রোহী কবি নজরুলের নাম** স্মরণযোগ্য। কাজী নজরুল ইস্‌লাম বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নজরুল তাঁর শক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কেতাবী শিক্ষার চেয়ে বেশী জানা যায় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির সাহায্যে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ কালে তিনি সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং হাবিলদার পদ পর্যন্ত উন্নীত হন। তখন বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হন এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, অবিচার, ভণ্ডামি, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার ইত্যাদি তাঁর মনে এক তীব্র আন্দোলনের সূচনা করে।

কাজী নজরুল ইসলাম

যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে এসে লেখনী অস্ত্র দ্বারা পুনরায় সংগ্রাম শুরু করেন। অন্যায়, অবিচার, অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সে সময় তাঁহার একটি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। নাম তার "অগ্নিবীণা"। অগ্নিবীণা জনসাধারণের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। পরাধীনতার

যে শিকল তাদের হাতে-পায়ে জড়িয়ে ছিল, সে শিকল ভাঙ্‌তে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। নজরুলের কবিতা ও গানে বাঙালী যুবকদের মনে যে প্রেরণা ও উৎসাহ জাগিয়েছিল, তেমন আর বোধ হয় কোন কবির কবিতা ও গানে সম্ভব হয় নি। তাঁর কবিতা ও গানে তিনি অন্যান্য ভাষার শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। তার ফলে বাঙলা ভাষায় অনেক বিদেশী শব্দের আমদানী হয়েছে এবং বাঙ্‌লা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' ছাড়া তার প্রধান কাব্যগ্রন্থের নাম 'বিষের বাঁশী' 'সর্বহারা,' 'দোলনচাঁপা,' 'সিন্ধুহিল্লোল' ইত্যাদি। তিনি বহু চমৎকার গান লিখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের পর নজরুলের জনপ্রিয় গানের সংখ্যা বোধ হয় অন্য সকলের চেয়ে বেশী। কাজী নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁহার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। কবি নজরুল আজও নানারূপ শোক এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন্মৃত অবস্থায় আছেন। ভারত সরকার কাজী নজরুলের রোগমুক্তি এবং সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও অর্থ সাহায্য করছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহী কবি নজরুলের দান অসামান্য।

কামিনী রায়

এই প্রসঙ্গে আর একজন মহিলা কবির নাম স্মরণীয়। তিনি কবি কামিনী রায়। কামিনী রায় বরিশাল জিলায় বাসণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল চণ্ডীচরণ সেন। স্বামীর নাম কেদারনাথ রায়। কামিনী রায়ের কবিতা হ'তে বহু নরনারী উদ্দীপনা লাভ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। বি. এ. পাশ করার পর তিনি কোলকাতার বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ লাভ করেন। এর কয়েক বছর পর তাঁর 'আলো ও ছায়া' কবিতার বইখানি প্রকাশিত হয়। দেশ মাতৃকার প্রতি কবি কামিনী রায়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 'মা আমার' কবিতাটি তার জাতীয় ভাবের অপূর্ব প্রকাশ।

কামিনী রায়

"মরিব তোমারি কাজে বাঁচিব তোমারি তরে
নহিলে বিষাদময় এ-জীবন কেবা ধরে?
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর
দুখিনী জনমভূমি—মা আমার মা আমার।"

সেকালের পরাধীন ভারতে একালের স্বাধীন ভারতের এক অতি উজ্জ্বল গৌরবময় রূপ কল্পনা করে কবি লিখেছিলেন—

"আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান,
আসিছে যেন গো তেজ মূর্তিমান
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ভারত রমণী সাজাইছে ডালি
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয় মালা
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা"।

কবি কামিনী রায় চেয়েছিলেন, বাংলা তথা ভারতের নারীগণ শিক্ষার নির্মল আলোকে, শক্তির বিদ্যুৎ-ঝলকে মহীয়সী হ'য়ে উঠুক।

দুর্গাবতী

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নারীগণের অবদানও কম নয়। রণ-রঙ্গিনী এক নারীর কণ্ঠ থেকে এই বীরত্বপূর্ণ কথাগুলো বেরিয়ে এল—"রাজ্য আমাদের ছোট, শক্তি আমাদের অল্প কিন্তু জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যতো আমাদের অল্প নয়। আমরা কাপুরুষ নই, জন্মভূমির প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে, আজ আমরা তারই প্রমাণ দিব।" একটু পরেই আবার তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল, "অগ্রসর হও দেশজননীর বীর সন্তানের দল, শত্রুনিধনে এগিয়ে চলো, তোমাদের তরবারি জন্মভূমিকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করুক।" এই উৎসাহবাণী যিনি উচ্চারণ করেছিলেন তিনি মধ্যপ্রদেশের ক্ষুদ্র গড়মণ্ডল রাজ্যের **রাণী দুর্গাবতী**। স্বামী দলপৎ-এর মৃত্যুর পর দুর্গাবতী নাবালক পুত্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। সন্তানকে সুশিক্ষিত

করে গড়ে তুলতে মা যেমন পারেন আর কেউ তেমন পারেন না। পারবার কথাও নয়। রাণী দুর্গাবতী দেখিয়েছিলেন তার প্রজারূপী সন্তানদের হিতসাধনে তিনি কোন রাজ্যের রাজার চেয়ে কম নন। সম্রাট আকবরের আদেশে সেনাপতি আসফ্ খাঁ দুর্গাবতীর গড়মণ্ডল রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু রাণী দুর্গাবতী যুদ্ধং দেহি বলে রণহুঙ্কার দিলেন। হাতীর পিঠে চড়ে আঠার বছরের পুত্রকে পাশে নিয়ে তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নারী শুধু অবলা নয়—তাহা তিনি রণক্ষেত্রে প্রমাণিত করলেন। যুদ্ধকালে একটি বিষাক্ত তীর তার কণ্ঠে বিদ্ধ হল। হাতীর মাহুত নিরাপদ স্থানে রাণীকে নিয়ে যেতে চাইলে, তিনি বললেন "আমি কি আমার জীবন বাঁচাবার জন্য জননী জন্মভূমিকে শত্রুর মুখে ফেলে রেখে পালাব, আমি কি জন্মভূমির এমনই কুসন্তান ?"

যুদ্ধে রাণী দুর্গাবতীর পরাজয় হল, পুত্র বীরনারায়ণ শত্রু হস্তে নিহত হলেন। রাণী দুর্গাবতী আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য নিজের হাতে নিজের বুকে তরবারি বসিয়ে দিলেন। তিনি প্রাণ বিসর্জন করলেন, তবু পরাধীনতার শিকল পরে মনুষ্যত্বের অবমাননা করলেন না।

লক্ষ্মী স্বামীনাথন

রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহিনীর মধ্যে ভারতীয় নারীরাও ছিলেন। নারী বাহিনীর অধিনায়িকা ছিলেন **লক্ষ্মী স্বামীনাথন**। লক্ষ্মী স্বামীনাথন ছিলেন তখন সিঙ্গাপুরের একজন চিকিৎসক। তিনি ভাবলেন, 'ভারত ভুগছে

এক অতি মারাত্মক ব্যাধিতে, পরাধীনতাই হচ্ছে সেই ব্যাধি ; মুক্ত কৃপাণ দিয়ে অস্ত্র চিকিৎসা করে ঐ ব্যাধি দূর করতে হবে। আমি চিকিৎসক, আমার এখন সেই চিকিৎসায়ই আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। এই ভেবে তিনি আজাদহিন্দ ফৌজে যোগ দিলেন। নারী সৈনিকদের নিয়ে ঝাঁন্সী বাহিনী গঠিত হল। নেতাজী লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে তার পরিচালনার ভার দিলেন। রেবা সেন, শিপ্রা সেন, রাণু ভট্টাচার্য, মায়া গাঙ্গুলী, বেলা দত্ত প্রভৃতি ভারতের বহু নারী সেই বাহিনীর সৈনিক হয়ে জন্মভূমির জন্য অস্ত্রধারণ করেছিলেন।

লক্ষ্মী স্বামীনাথন

"ভারতনারী জাগরে জাগ মুক্তি যুদ্ধে লাগরে লাগ।
ঘোড়ায় চড় কৃপাণ ধর, অরির বুকে ঝাঁপিয়ে পড় ;
হানরে হান মৃত্যু বান, যাক প্রাণ থাকুক মান।
রক্ষা কর মুক্ত কর, তোদের ঘর তোদের বর।"

ঝাঁন্সীর নারীবাহিনী সুদীর্ঘ ষোল ঘণ্টা ধরে বীরদর্পে যুদ্ধ চালিয়ে ছিল। ভারতনারীর সেই অভূতপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী চিরকালই মানুষকে বীরত্বের প্রেরণা দেবে। ভারতের মেয়েদের শুধু নারী হয়ে থাকলেই চলবে না। তাঁদের হতে হবে দেশমাতৃকার বীর সন্তান।

মাতঙ্গিনী হাজরা

এখন বলি এক বৃদ্ধা বীরাঙ্গনার কাহিনী। জননী জন্মভূমির দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করবার জন্য যখন তাঁর ডাক পড়ল, তখন শত্রুর উদ্যত তরবারির মুখেও তাঁর পদ দ্রুত এগিয়ে গেল—এই বৃদ্ধার নাম **মাতঙ্গিনী হাজরা**। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সারা দেশব্যাপী আগস্ট আন্দোলন চলছে। ইংরেজের গুলীতে কত ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছে, বহু নর নারী কারাবরণ করেছেন। মেদিনীপুরের ৭৫ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী রণরঙ্গিনী মূর্তি নিয়ে ডান হাতে জাতীয় পতাকা ধারণ করে এগিয়ে চলেছেন। ইংরেজ সৈনিকের গুলী বৃদ্ধার ডান হাত বিদ্ধ করল। তিনি এবারে বাঁ হাতে পতাকা ধরলেন। নৃশংস ইংরেজ সৈন্য বাঁ-হাতও গুলী বিদ্ধ করল। তখন তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন সেই তেরঙ্গা পতাকা। তার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তবুও পতাকা হস্তচ্যুত হল না। তিনি পতাকার সম্মান আমরণ রক্ষা করেছিলেন।

মাতঙ্গিনী হাজরা

গত পাক-ভারত যুদ্ধেও বহু ভারতীয় নারী সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করে ভারত জোয়ানদের সহযোগীতা করেছেন। সমরাঙ্গন

ছাড়াও অসংখ্য ভারতনারী জোয়ানদের পোষাক-পরিচ্ছদ, খাত্তদ্রব্য ও নানা উপকরণ যোগান দিয়েছেন।

প্রীতিলতা

ভারতে যখন পরাধীনতার যুগ, বিদেশী ইংরেজ তখন ভারতের শাসক। জাতির পক্ষে পরাধীনতার চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই। শাসক ইংরেজ তখন নির্মমভাবে দেশের লোকের উপর অত্যাচার-অবিচার চালাচ্ছিল। কারও মনে শান্তি ছিল না। ভারত-সন্তানের অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ছিল না, কিন্তু জন্মভূমিকে সেবা করবার অধিকার ছিল। ইংরেজের আইনে দেশের সেবা' করাও দেশবাসীর পক্ষে অপরাধ বলে গণ্য হয়।

ভারত-মাতার কোন সন্তান যখনই তাঁর মুক্তি কামনা ক'রে জাতীয় নিশান তুলেছে, তখনই সেই বিদেশী দুঃশাসন তার মাথায় বন্দুক-বেয়নেট্ উঁচু ক'রে তুলে ধরেছে আর শাসিয়ে ব'লেছে—

"বন্দে মাতঃ। গাইবে যেই,
রক্ষা নেই—রক্ষা নেই।
দেশের নিশান তুলবে যেই,
রক্ষা নেই—রক্ষা নেই।"

কিন্তু 'রক্ষা নেই' জানা সত্ত্বেও ভারত মাতার নারী-পুরুষ অনেক সু-সন্তানই মায়ের বন্দনা গান গেয়েছেন। জীবনের মমতা ভুলে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলেধরে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের গুলী বুক পেতে নিয়েছেন। তাঁদেরই প্রতি শ্রদ্ধায় মন কানায় কানায় ভরে উঠছে। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার।

ভারতের প্রতি প্রীতিতে তার হৃদয় ছিল পূর্ণ। সেই প্রীতিই তাঁকে ভারতমাতার পরাধীনতার শিকল চূর্ণ করতে উৎসাহিত করেছিল, তাই তাঁর প্রীতিলতা নাম সার্থক হয়েছে।

প্রীতিলতা

খরশান তরবার আর রণ-হুঙ্কার এসব নারীর জন্য নয়—একথা যারা বলে, তারা জানে না যে, নারীর শক্তি কতখানি; তারা ভুলে যায় যে, যিনি দশ-প্রহরণ-ধারিণী, যিনি অসুরঘাতিনী, তিনি পুরুষ নন—নারী।

প্রীতিলতা চট্টগ্রামের এক দরিদ্র ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন ঢাকায় ইডেন কলেজে পড়তেন, দীপালী সংঘের ব্যায়ামাগারে গিয়ে ছোরা খেলতেন, লাঠি খেলতেন। ভারত-সন্তান ভারতের জন্য জীবন দান করবে—এই শিক্ষার বীজ তখন থেকেই প্রীতিলতার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল।

ভারতে তখন স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলছিল। একদিকে কংগ্রেসের আন্দোলন, অন্যদিকে বিপ্লবীদের রণোদ্যম। প্রীতিলতা ভাবলেন এখন আমি কি করব?

অমনি তুচ্ছ সাংসারিক সুখ এসে তাঁর কানে বলল, "তুমি লেখাপড়া শিখেছ, এখন তুমি অনায়াসেই অর্থ উপার্জন করতে পার। স্বামী-পুত্র পরিবৃত হয়ে তুমি ঘর-সংসার করে সুখী হও।"

প্রীতিলতা, স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক, বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগদান

করলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক দেশ-সেবক বিপ্লবী সূর্য সেনের কাছ থেকে প্রীতিলতা ভারতের শত্রুকে নিপাত করবার একটি অভিযানের ভার পেলেন। তিনি তাঁর কর্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালনও করেছিলেন—ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ ক'রে শহীদ হয়েছেন।

"মরণ তব স্বাধীনতার হ'ল বরণ-ডালা,
ধন্য তুমি, ধন্য তুমি, ধন্য বীরবালা।"

সংকল্প

"**জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।**" মাকে যেমন আমরা সবাই ভালবাসি ও ভক্তি করি সেই রকম দেশমাতাকে ভালবাসব ও ভক্তি করব, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আমরা দেশের লোককে ভালবাসব। ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশের বহু সন্তানকে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতের বহু বীরসন্তান দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের সকলের মিলিত চেষ্টায় আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। আমাদের দেশের দুই শত্রু রয়েছে—চীন ও পাকিস্তান। ১৯৬২ সালে লাল-চীনেরা আমাদের দেশকে আক্রমণ করেছিল। আমরা আমাদের দেশমাতৃকাকে আর কখনও পরাধীন হতে দেব না। দেশকে বাঁচাবার জন্য সকল রকম স্বার্থ ত্যাগ করব, সবরকম ত্যাগ স্বীকার

করব, আমাদের সর্বস্ব দিয়ে দেশমাতাকে রক্ষা করব, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন দেব। সকল সময় আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ রাখতে হবে, "হে ভারত, ভুলিও না—হীনজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

আজ সমস্ত ভারতবাসীর মনে সেই বাণী প্রেরণা যুগিয়েছে, সমস্ত ভারতবাসী আজ সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতের শক্তির কাছে আজ আর কোন শক্তিই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

ভারতের আত্মরক্ষার জন্য চাই তাহার সর্বাত্মক প্রস্তুতি—তাই যে লোক যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায়ই তাকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতির কাজে লাগতে হবে। কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সৈনিক—সকলেই যার যার কাজ দিয়ে এক লক্ষ্যে সংহত হবে। সকলের স্বার্থই এক—মাতৃভূমির জন্য স্বর্ণ, অর্থ, রক্ত, আর প্রাণদানে প্রস্তুতি। আজ ভারত অখণ্ড, ভারতের নরনারীর সত্তা অখণ্ড ও অবিভাজ্য।

জাতীয়-পতাকা
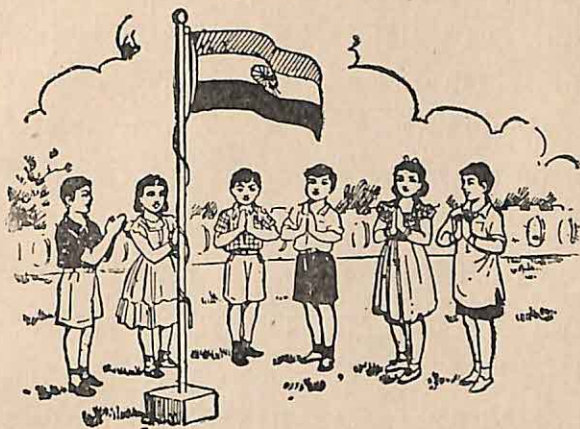
প্রত্যেক দেশেরই একটি জাতীয়-পতাকা আছে। এই পতাকার সম্মান সর্বোচ্চে এবং উহা রক্ষার জন্য দেশবাসীর প্রাণ উৎসর্গিত। পতাকা বহন করবার শক্তি যে সকল জাতির নাই, তাঁদের পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হয়। স্বাধীনতা রক্ষার স্পৃহা যে সকল জাতির মধ্যে যত বেশি সেই দেশে জাতীয় পতাকার মর্যাদাও তত বেশি। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে। তেরঙা পতাকা সরকারী গৃহচূড়াতে উড়ছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট মধ্যরাত্রে ইংরাজের 'ইউনিয়ন জ্যাক' ভারতের আকাশ হতে নেমে গিয়েছে। তার স্থান গ্রহণ করেছে আমাদের বর্তমান পতাকা। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই গণপরিষদে এই তেরঙা পতাকাই ভারতের স্থায়ী জাতীয় পতাকা হিসেবে গৃহীত হয়। পূর্বেকার পতাকার চরকার পরিবর্তে অশোকস্তম্ভ গ্রহণ করা হয়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তিনটি রংয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে গেরুয়া রঙ ত্যাগকে বুঝায়,

মাঝখানে সাদা রঙ্ আলোর ইঙ্গিত করে, যে আলো আমাদের সত্যের পথ দেখাবে। সবুজ আমাদের সঙ্গে মাটির অর্থাৎ তরুজগতের সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে। মাঝখানের চক্রটিকে তিনি ধর্মের চক্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারত-সরকার জাতীয় পতাকা ব্যবহার সম্বন্ধে কতগুলি নিয়ম করেছেন। এই নিয়মগুলি ভারতবাসী মাত্রই পালন করা কর্তব্য।

কোন বস্তু ও মানুষের শরীরে জাতীয় পতাকা লাগান চলবে না। একই স্থানে অন্য কোন পতাকা ব্যবহার করতে হলে জাতীয় পতাকার বাম পার্শ্বে করতে হবে।

জাহাজের মাস্তুলে অন্য পতাকা ওড়াতে হলে জাতীয় পতাকা সর্বোচ্চে থাকবে। কোন মিছিলে জাতীয় পতাকা সর্বাগ্রে থাকবে। সাধারণতঃ সরকারী ভবনে এই পতাকা ওড়ান হয়। সীমান্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় পতাকা তোলা হয়। ইহাই রাষ্ট্রের সীমানা নির্দেশ করে। স্বাধীনতা দিবস বা নেতৃবৃন্দের জন্মদিবসে এই পতাকা ব্যবহারে কোন বাধা-নিষেধ থাকে না। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ঐ সকল দিনে পতাকা তুলতে পারেন এবং সভা-সমিতিতে এর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে উত্তোলন করতে পারেন। দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এই জাতীয় পতাকাই স্বাধীনতার প্রতীক।

শান্তিকামী ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত

ভারত শান্তিকামী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের কোন স্থান নেই। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন

বিশেষ ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে না, কোন ধর্মের উপরেই হস্তক্ষেপ করে না। সকল ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে। আইনের চক্ষে তাঁরা সকলেই সমান, যে কোন লোক ইচ্ছামত তাঁহার ধর্ম আচরণ করতে পারে। কেহ ইহাতে বাধা দিলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিবে। আধুনিক গনতন্ত্র সকলের জন্য। কোন ধর্মের প্রধান্য থাকলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আধুনিক যুগে জগতের সকল ধর্মের আলোচনার সুযোগ বেড়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছেন, "আমরা যে ধর্মাবলম্বীই হই না কেন, আমরা একই ভারত মাতার সন্তান।"

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতে সর্বপ্রথম ধর্মের শাসন দেখা দেয়। নবাব-বাদশাহগণ ইস্লাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া অপর কোন প্রজাকে সুযোগ-সুবিধা দিতেন না, মুসলমান মাত্রেই ছিল রাজ্যের সব কিছু। বলপ্রয়োগ দ্বারাও ধর্মান্তরিত করা হত। কিন্তু ভারত-সংবিধানে সকলের সমান অধিকার।

এখানে সব ধর্মে মানুষের সমান অধিকার, এদেশের নাগরিক সবার আগে ভারতীয়। তার পরে সে পাঞ্জাবী, মারাঠী, বাঙালী, তামিল এবং তারপরে সে হিন্দু, মুসলমান, শিখ কি খৃষ্টান। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বড় তফাৎ এখানেই। পাকিস্তানের নাগরিক আগে মুসলীম তারপরে পাঞ্জাবী এবং পাকিস্তানী সবশেষে। পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর কোন নাগরিক অধিকার নেই। আর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন একজন মুস্লীম্, প্রাক্তন তৈল ও জ্বালানী মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরও একজন মুস্লীম্, জাতীয়

সংঘের স্বস্তি পরিষদে যিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেই মহম্মদ করিম চাগলাও একজন মুস্‌লীম্। এদের মত হাজার মানুষ বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এরা মুস্‌লিম্—এ পরিচয় নিতান্তই গৌণ। এদের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় এরা ভারতীয়।

তাসখন্দ শীর্ষ সম্মেলন

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আবার নূতন করে যাতে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সি কোসিগিন উভয় রাষ্ট্রপ্রধানকে তাসখন্দে উজবেকি-

উজবেকিস্থানের মন্ত্রণালয়
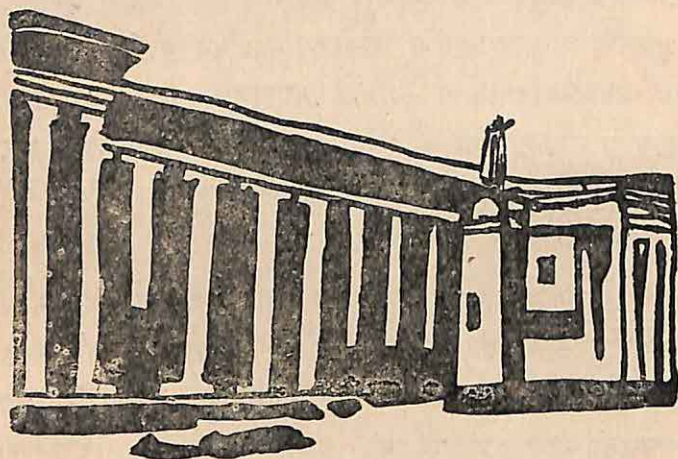
স্থানের মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁন এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালের

ধরে আশা ও নিরাশার মধ্য দিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে উভয় কক্ষের গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ সন্ধান করতে হয়েছে। সংগ্রামরত দুই দেশের নেতা একত্রে মিলিত হয়ে সকল রকম জটিল সমস্যার যাতে সমাধান হয় তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

আলেক্সি কোসিগিন

১০ই জানুয়ারী বেলা ৩-৩০ মিনিটের পরে নয়দফা ভারত-পাকিস্তান চুক্তিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁন স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি-ঘোষণায় বলা হয়েছে—বিরোধ মীমাংসায় বল প্রয়োগ বর্জন করা হবে, উভয়পক্ষই সৈন্য অপসারণ করবেন, যুদ্ধবন্দী বিনিময় হবে, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—সবক্ষেত্রেই দেশের সম্পর্কের উন্নতির জন্য উভয় রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবেন। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকালে উপস্থিত ছিলেন উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সি কোসিগিন, সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ আই, এম, জেস্‌কোড্ এবং আরো অনেক সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দ ঘোষণাকে "শান্তি ও সাধারণ

প্রেঃ আয়ুব খাঁন লালবাহাদুর শাস্ত্রী

জ্ঞানের জয়" বলে অভিহিত করেন। পাক-ভারত সমস্যার কোন মীমাংসায় অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না—শাস্ত্রী এবং আয়ুব খাঁনের যুক্ত প্রতিশ্রুতি বর্তমান দুনিয়ার অস্বস্তিকর পরিবেশে এক নূতন আশার ইঙ্গিত এনেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন্‌সন্ তাসখন্দ চুক্তিকে অভিনন্দিত করেছেন এবং তিনি আশা করেন এই চুক্তি সমগ্র বিশ্বের শান্তির পথ প্রশস্ত করবে।

পরলোকে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

১৯৬৭ সালের ১১ই জানুয়ারী সোমবার ভোর ১-৩২ মিনিটে (তাসখন্দ সময়) তাসখন্দ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে নিরপেক্ষ নিকেতনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী পরলোক গমন করেন। বুকে বেদনা অনুভব করার সাত মিনিটের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাসখন্দ-চুক্তি স্বাক্ষর করার পরে রাত এগারটার সময় তিনি শুতে যান। ১-৫ মিনিট পর্যন্ত তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। ১-২৫ মিনিটের সময় তিনি পাশের ঘরের এক পরিচারককে বলেন, "ডাক্তার বোলাও, ডাক্তার বোলাও—ছাতিমে দরদ হো রহা হ্যায়।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তার আর, এন, চুঘ এসে পরীক্ষা করে একটা ইন্‌জেকসান দেন, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে আরো দশ বারজন ডাক্তারসহ মিঃ কোসিগিন উপস্থিত হন, তখন শাস্ত্রীজী সকল চিকিৎসার বাইরে চলে গিয়েছেন। ঐ রাত্রেই বেতারযোগে শাস্ত্রীজীর মৃত্যু-সংবাদ ভারতবর্ষে পাঠান হয়। এই নিদারুণ সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। বেলা বারোটার সময় একখানা রুশবিমান শাস্ত্রীজীর মরদেহ নিয়ে দিল্লী যাত্রা করে।

সোভিয়েট রাশিয়া এবং তাসখন্দ পূর্ণ সামরিক মর্যাদা সহকারে প্রধানমন্ত্রীকে শেষ বিদায় জানায়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য একুশবার তোপধ্বনি করে। শাস্ত্রীজীর প্রাণহীন দেহকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উজবেক সাধারণতন্ত্রের রাজধানী শহরের রাস্তার দু'ধারে লক্ষ লক্ষ লোক নতশিরে দাঁড়িয়ে

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। বিমানঘাঁটিতে শবাধার বহন করেছিলেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন্, পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁন এবং ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ। বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যালিনোভস্কি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো এবং উজবেক সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মাদাম নাসিরুদ্দিনোভা।

কয়েকদিন আগে যারা শাস্ত্রীজীকে করতালি দিয়ে সাদর-সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন আজ তারাই তাঁকে চোখের জলে বিদায় জানালেন। রুশবিমানটি পালাম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিলে একটি কামানবাহী শকটে তেরঙ্গা পতাকায় ঢাকা শবাধারটি স্থাপিত করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দশ নম্বর জনপথে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাস-ভবনে আনা হয়। মাতা শ্রীমতী রামদুলালী দেবীর ঘরে একঘণ্টা শব-দেহ রাখা হয়। পরে সাধারণের দর্শনের জন্য ইহা একটি উঁচু বেদীতে স্থাপন করা হয়। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাদের প্রিয় নেতাকে শেষবারের মত দেখবার জন্য সমবেত হয় এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। ১২ই জানুয়ারী বুধবার সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটের পরে শোভাযাত্রা সহকারে জনপথ, রাজপথ, ইণ্ডিয়া গেট, তিলকমার্গ, ইন্দ্রপ্রস্থ ও লিঙ্করোড্ অতিক্রম করে শবদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিবনে। যেখানে আর একজন শান্তির পূজারী পণ্ডিত নেহরু চিরশান্তি লাভ করেছেন। যমুনার তীরে শাস্ত্রীজীর মরদেহ চন্দন কাষ্ঠের চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়। শাস্ত্রীজীর পুত্র হরিকিষণ ও তার তিন সহোদর পিতার শেষ কাজ করেন। ২৫শে জানুয়ারী মঙ্গলবার সামরিক মর্যাদা সহকারে শাীস্ত্রজীর চিতাভস্ম প্রয়াগে গঙ্গা

ও যমুনার পুণ্য সঙ্গমস্থলে বিসর্জন দেওয়া হয়। শাস্ত্রীজীর মৃত্যু-সংবাদে বিশ্বের সকল প্রান্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শোকজ্ঞাপন করেন এবং শাস্ত্রীজীর পরিবারবর্গকেও ভারতবাসীদের সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানান। শান্তির প্রয়াসে শাস্ত্রীজীর আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

শ্রদ্ধেয় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর অস্থায়ীভাবে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ প্রধানমন্ত্রীর শপথ-গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী ৩৫৫-১৬৯ ভোটে জয়লাভ করে শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসে সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। ২৪শে জানুয়ারী সোমবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর এলাহাবাদে আনন্দভবনে শ্রীমতী ইন্দিরার জন্ম হয়। ১৯৬৩ সালে মাতা কমলার মৃত্যুর পরে পিতার স্নেহ ও সান্নিধ্য বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শৈশব হতেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হন। সকল সময়ই বাবা, ঠাকুরদা, পিসীমার কাছে নানারকম রাজনীতি সম্পর্কীয় আলোচনা শোনার সুযোগ হতো। সাধারণ মেয়েদের মত খেলাধূলা নিয়ে তিনি সময় নষ্ট করতেন না। এলাহাবাদে একটি স্কুল থেকে তাঁর শিক্ষা শুরু হয় এবং শেষ হয় অক্সফোর্ডের সোমারভিল কলেজে। মাঝখানে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে এবং সুইজারল্যাণ্ডে। শান্তিনিকেতনে থাকা-

কালীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিদ্ধ লাভ করেন। শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত জওহরলালকে লিখেছিলেন—"সত্যিই খুসীভরা প্রিয়দর্শিনী মেয়ে। শিক্ষক ও সহপাঠীদের মনে সে রেখে গেছে এক মনোরম স্মৃতি। সে তোমার চরিত্রবল ও ধ্যান-ধারণা পেয়েছে।" তখন শ্রীমতী ইন্দিরার বয়স মাত্র আঠার বছর। শ্রীমতী ইন্দিরাকে দেখলে হয়ত মনে হবে যে এই কোমল শরীরে কোন কাজের চাপ সইবে না। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং কর্মঠ। দিনে নিয়মিত দশ-বার ঘণ্টা কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ইন্দুর সঙ্গে পিতার পরিচয় হয় অনেক বড় হয়ে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

শ্রীমতী ইন্দিরা মাতা কমলার মত শান্তস্বভাবের নন, পিতার মতই কর্মচঞ্চল। একুশ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন! এর পূর্ব হ'তেই তাঁর সংগঠনশক্তি প্রকাশ পায়। তিনি বার বছর বয়সে কিশোর-কিশোরীদের একটা সংস্থা গড়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের

সাহায্যদানই ছিল তাঁর একমাত্র কারণ। ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সান্নিদ্ধ লাভ করেন। ব্রিটিশ রাজত্বকালে তেরমাস কারাবরণও করেছেন। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বস্তিতে বস্তিতে কাজ করেন! ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা হন। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটি ও কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যা হন। তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছেন। যথা—১৯৫৩ আমেরিকাঃ মাদার্স অ্যাওয়ার্ড ইয়েল ইউনিভার্সিটি ঃ হাভল্যাণ্ড মেমোরিয়াল প্রাইজ। ১৯৬৫ ইটালী ঃ শ্রেষ্ঠ মহিলা কূটনৈতিক পুরস্কার। তিনি বেশ কয়েকবার ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন। বিশ্বের কূটনৈতিক মহলে তিনি সুপরিচিতা। শ্রীমতী গান্ধী এক কঠিন সময়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাসখন্দ ঘোষণার ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে পাকিস্তানের সঙ্গে নূতন বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে, খাদ্যাভাব সমস্যার সমাধান এবং আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করতে হবে। ইতিমধ্যেই তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাসখন্দ চুক্তি যথাযথ কার্যকরী করা হবে। আমরা আশা করি ভারবর্ষের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল মানুষের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধান করবেন।

———

'শেখ মুজিবর রহমান ও বাংলাদেশ'

পাকিস্তানী নির্বাচন অনুসারে জাতীয় পরিষদে এক নম্বর দল ছিল আওয়ামী লিগ্, দুই নম্বর ছিল—পিপল্স পার্টি। রেওয়াজ অনুযায়ী সরকার গঠন করার কথা আওয়ামী লিগের। আর প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল পিপল্স পার্টির। অন্য দেশ হলে তাই হতো!

আওয়ামী লিগ্-নেতা শেখ মুজিবর রহমান প্রধান মন্ত্রী হবেন এটা বরদাস্ত করতে চাইলেন না পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তাই পূর্ব-পাকিস্তান জঙ্গি-চক্রের হাত থেকে অব্যাহতি পেল না। সব ভেস্তে দিল ভুট্টো। বিরোধী দলের নেতা হয়ে থাকতে তিনি নারাজ। ভুট্টোর ভয় হল শেখ মুজিবর রহমান যদি প্রধানমন্ত্রী হন তবে পশ্চিম পাকিস্তানের মাতব্বরি পূর্ববঙ্গের উপর চলবে না।

শেখ মুজিবর রহমান

পূর্ববঙ্গের ধনসম্পদ এতকাল লুটে-পুটে পশ্চিম পাকিস্তান কলেবর পুষ্ট করেছে। তারা আধিপত্য করেছে দেশের প্রশাসনে আর ফৌজে, নৌবাহিনীতে এবং বিমান বাহিনীতে। শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় পরিষদে

নির্বাচন ল'ড়ে ছিলেন পূর্বপাকিস্তানের মুক্তির দাবিতে। তাঁর কাছে পাকিস্তানের পূর্ব-এলাকা পূর্ব-পাকিস্তান নয়– **'বাংলাদেশ'**। বাংলা আর বাঙ্গালীর স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তিনি তাঁর দলবল নিয়ে দখল করেছেন জাতীয় পরিষদ, সেখানে নতুন করে তৈরী হবে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র। তিনি এতকালের অবিচার ধুয়েমুছে পূর্ব এলাকায় সুবিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। তিনি ভুট্টোর মত গদি চান না, তিনি চান পশ্চিমী গোষ্ঠির হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে। শুধু ভুট্টোই শেখ মুজিবর রহমানকে অস্বীকার করেননি, সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াও আছেন। ৩রা মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডেকেও বাতিল করে দেওয়া হয়, কারণ ভুট্টোর দল অধিবেশনে যোগদান করবে না। এই ব্যাপারে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সমস্ত পূর্ববঙ্গ। সেই বিক্ষুব্ধ জনতার উপরে গুলি চালায় পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচী ফৌজ। হাজার হাজার নিরস্ত্র নরনারীর রক্তে ঢাকার রাস্তা লাল হয়ে উঠল। মেসিনগানের গুলি কিন্তু রোধ করতে পারল না বাঙ্গালীর বাঁচার দাবি।

মিঃ জেড্. এ. ভুট্টো

জল্লাদ ইয়াহিয়া খাঁ **২৫শে মার্চ** জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকাল।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ঐ অধিবেশনে যোগদানে রাজী হ'লেন না। শেখ সাহেবের ডাকে হরতাল পালিত হ'ল। সাতদিন পূর্ববাংলার জীবনযাত্রা অচল হ'য়ে গিয়েছিল। ইয়াহিয়া খাঁর বুলি আর গুলি তাকে সচল করতে পারেনি। শেখ মুজিবর জোর গলায় জানিয়ে দিলেন বাংলার মুক্তি আন্দোলন চলবে, যতদিন না তা সার্থক হয়। ১৬ই মার্চ সোমবার ইয়াহিয়া খাঁন্ ঢাকায় পৌঁছিবার পূর্বেই শেখ্ মুজিবর রহমান এক নির্দেশ জারী ক'রে বাংলা দেশে তাঁর শাসন কায়েম করেন। শেখ্ মুজিবর ঘোষণা ক'রলেন—তিনি সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর নির্বাচিত নেতা এবং তাঁর দলের প্রাধান্যের ভিত্তিতে তিনি এই ব্যবস্থা করলেন।

পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ

বিপদ বুঝে ভুট্টো কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। ২১শে মার্চ রবিবারেও শেখ্ মুজিবের সঙ্গে সত্তর মিনিট ইয়াহিয়া খাঁনের আলাপ আলোচনা চলে। এইদিন পিপলস্ পার্টির নেতা ভুট্টো ঢাকায় ইয়াহিয়ার সঙ্গে মিলিত হন। উভয়ের মধ্যে কি আলাপ-

আলোচনা হয় তা কাউকে বলা হয় না। ৭ই মার্চ ঢাকা রেস্ কোর্স ময়দানে শেখ্ মুজিবর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন—"আপনারা সবাই জানেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা ক'রছি বাংলাকে মুক্ত করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজসাহী, রংপুরে আমার বাঙ্গালী ভাইদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচবার পথ চায়। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেন আওয়ামী লিগ্ নেতা হিসেবে। এসেম্বলীতে বস'ব, সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করব।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। এই ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুন আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়। আয়ুবের পরে ১৯৬৯ সনে ইয়াহিয়া খান্ প্রেসিডেণ্ট হলেন। তিনি ব'ললেন শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, তারপর অনেক ইতিহাস রচিত হ'ল। ৭ই ডিসেম্বর আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। ভুট্টো সাহেব ভয় দেখালেন, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যোগদান করলে এ্যাসেম্বলি কসাইখানায় পরিণত হবে। যদি কেউ এ্যাসেম্বলিতে আসেন তবে পেশোয়ার

থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান-পাট জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এ্যাসেম্বলি চলবে। হঠাৎ এক তারিখে এ্যাসেম্বলি বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। ইয়াহিয়া খান্ এ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডাকলেন। আমি বললাম আমি যাব। কিন্তু ভুট্টোসাহেব বললেন তিনি যাবেন না। পাঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন, কিন্তু এ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। তারা দোষী করল আমাকে—দোষ দিল বাংলার মানুষকে। এদেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। আমি হরতাল ডাকলাম, আমার ডাকে জনগণ সাড়া দিল। তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল।.........২৫ তারিখে এ্যাসেম্বলির অধিবেশন ডাকা হ'ল। আমি বলে দিলাম যে শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে মুজিবর যোগদান করতে পারে না। আমার দাবি মানতে হবে—প্রথমে সামরিক আইন তুলে নিতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ফিরিয়ে নিতে হবে আর জনগণের প্রতিনিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। তারপর বিবেচনা করব এ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না।

আমি প্রধান মন্ত্রিত্ব চাই না। আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আজ থেকে বাংলা দেশের কোর্ট-কাছারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবদের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী, রেল, লঞ্চ চলবে। কোন গভর্নমেণ্ট দপ্তর খোলা থাকবে না...........আর যদি একটা গুলি চ'লে, আর যদি আমার একটা লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।.........
মনে রাখবে রক্ত যখন দিতে শিখেছি রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়'ব—ইন্‌সাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বিগত ২৩ বছরের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান ৯ বৎসর কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ মুজিবর জন্ম গ্রহণ করেন ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। এই গ্রামখানা গোপাল-গঞ্জ মহকুমার অধীনে। সাধারণ গৃহস্থের ছেলে ছিলেন তিনি। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর ক'ল্‌কাতায় এসে ভর্তি হলেন ইসলামিয়া কলেজে, আজ যার নাম মৌলানা আজাদ কলেজ। সেখান থেকে বি. এ. পাশ করে আইন পড়া শুরু করলেন। তার প্রকৃত পরিচয় বাঙ্গালী বিপ্লবী বীর। এবং তার গুরুমন্ত্র ছিল—"সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" তিনি বলেছিলেন "ইয়াহিয়ার সৈন্যদের অনেক অস্ত্র আছে। তারা আমাকে বধ করতে পারে, কিন্তু আমি তাদের জানিয়ে দিতে চাই তারা কোন মতেই সাড়ে সাত কোটী বাঙ্গালীর শক্তি খতম করতে পারবে না। তারা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জান দেবে। ইয়াহিয়ার রাইফেলের নল বাংলার মানুষের স্বাধীন কণ্ঠ রোধ করতে পারবে না।"

পাকিস্তানের বাংগালী হত্যা ও ভারতে এককোটি শরণার্থী

এদিকে বহুরূপী প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় ২রা মার্চ কার্ফুর হুকুম দিলেন, কিন্তু ছাত্রদের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—বাংলার স্বাধীনতা

চাই। ছাত্ররা একটি পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে দিল। তারা পাকিস্তানের সকল আইন অমান্য ক'রে সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা শুরু কর'ল। ৬ই মার্চ গণবিক্ষোভে পূর্ববঙ্গ ভেঙ্গে প'ড়ল। রাস্তায় রাস্তায় জনতা ও সৈন্যদের মধ্যে লড়াই চ'ললো। ৬ই মার্চ জেনারেল টিক্কা খাঁকে পূর্ববঙ্গের নতুন গভর্নর করা হ'ল। ৭ই মার্চ রবিবার শেখ মুজিবর তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে পাক সৈন্যদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন। শেখ মুজিবরের ৪ দফা দাবি হ'লঃ (১) সামরিক আইন খারিজ করুন (২) সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে যান (৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন। এবং (৪) সাম্প্রতিক নিধন-যজ্ঞের তদন্ত হোক। সারা পূর্ববঙ্গে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। ১২ই মার্চ

জেঃ টিক্কা খাঁ

ইয়াহিয়ার দূত খুরসিদ্ ঢাকায় এলেন কিন্তু ১৫ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান বাংলা দেশের প্রশাসন স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন পাকিস্তানের বিচারপতি শ্রীকরণেলিয়াস ও ভূট্টোকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। ২১শে মার্চ ভুট্টো এক প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। ২২শে মার্চ শেখ মুজিবরের সঙ্গে ভুট্টোর

বৈঠক বসে। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া খাঁন মুজিবের সঙ্গে একমত হয় এবং মুজিবের ৪ দফা দাবি ইয়াহিয়া খাঁন মেনে নেয়। কিন্তু ২৫শে মার্চ শুরু হয় পাকিস্তানের তাণ্ডব নৃত্য। ঐদিন রংপুর, চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুরে পাক সেনার গুলিতে ১১০ জন বাঙ্গালী নিহত হয়।
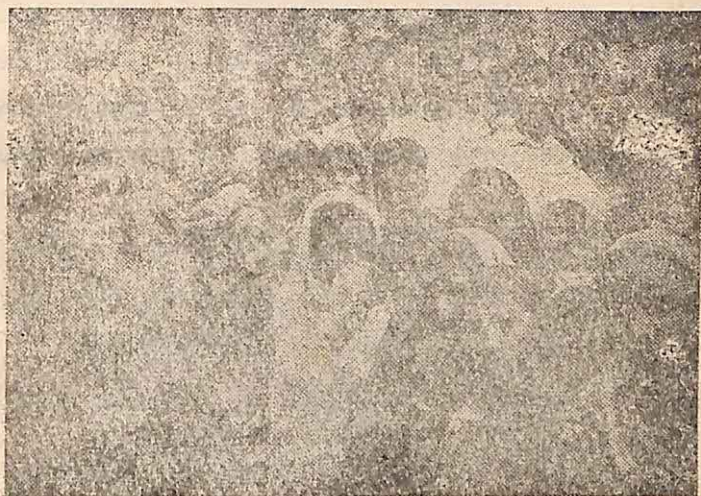
ভারতে আগত শরণার্থী

সেনাবাহিনী বাঙ্গালীর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর উপরে চালায় নির্বিচারে গুলি। প্রেসিডেণ্ট্ ইয়াহিয়া গভীর রাত্রে ঢাকা থেকে বিমানযোগে পালিয়ে যায়। আওয়ামী লীগ্ নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রদেশব্যাপী তল্লাসী চলে। সৈন্যদের মেসিন্‌গানের গুলিতে সহস্র সহস্র নরনারী নিহত হয়। ২৬শে মার্চ বাংলাদেশকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলা বেতার-

কেন্দ্র। আর অপর দিকে পাকিস্তান রেডিওতে ইয়াহিয়া খাঁন ঘোষণা করেন মুজিবর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী, পাকিস্তানের দুষমন। পাকিস্তানী সৈন্যদের নারকীয় অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দলে দলে সমস্ত সীমান্ত দিয়ে ভারতভূমিতে ঢুকে পড়ে। এই শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।

মুক্তিফৌজ ও বাংলাদেশ

২৬শে মার্চ গভীর রাতে ঢাকার ধানমণ্ডির বাড়ী থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাঠানো হয় পশ্চিম

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সেনাপতিসহ বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী

পাকিস্তানে। কিন্তু বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুক্তি আন্দোলন চলতে

থাকে। গঠিত হয় মুক্তিফৌজ। মুক্তিফৌজকে সম্প্রসারিত করে গড়া হয়েছে মুক্তি-বাহিনী। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেয়। সেই রাষ্ট্রের জনক শেখ মুজিবর রহমান। এই রাষ্ট্রের নাম হ'ল 'স্বাধীন বাংলাদেশ।' সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হলো রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" এই রাষ্ট্রের রয়েছে নিজস্ব পতাকা, রয়েছে নিজস্ব বেতার এবং পরে বের হয়েছে নিজস্ব ডাক টিকিট্। বাংলা দেশের ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন আওয়ামী লিগের অন্যতম নেতা ইউসুফ আলী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন তাজউদ্দিন আমেদ। পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার, মুস্তাক আমেদ, অন্যান্য মন্ত্রী শ্রীমনসুর আলী ও কামারুজ্জমান। কর্ণেল ওসমানি হয়েছেন প্রধান সেনাপতি এবং কর্ণেল আবদুল রব 'চীফ্ অফ দি স্টাফ'। এই নতুন রাষ্ট্র বিশ্বের সকল গণতন্ত্রী দেশের কাছে স্বীকৃতি ও সাহায্য পাওয়ার অনুরোধ জানালো।

এদিকে বাংলা দেশ থেকে অবিরাম-শরণার্থীর স্রোত ভারতে আসতে লাগল। ১৮ই মে পাকিস্তানী সৈন্যরা বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর উপর গুলি চালায় এবং এতে কয়েকজন রক্ষী নিহত হয়। ১৯শে জুলাই মুক্তি যোদ্ধারা ঢাকার ৩টি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়। ২০শে জুলাই রংপুর, কুমিল্লা এবং শ্রীহট্ট সেকটার মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের উপরে প্রচণ্ড আঘাত হানে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ

২২শে নভেম্বর পাক বিমান বাহিনীর ৪টি স্যাবারজেট্ ভারতের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করলে ভারতীয় জোয়ানরা ৩টি বিমানকে ভূপাতিত করে ও দুইজন পাক বৈমানিক বন্দী হয়। ভারতীয় তিন বৈমানিক ফ্লাইট লেঃ আর ম্যাসি, ফ্লাইট লেঃ এম. এ. গণপতি ও ফ্লাইং অফিসার ডি. ল্যাজারস তিনটি পাক স্যাবার জেট খতম করেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবনরাম তাদের বীরত্বকাহিনী শুনে বৈমানিকদের পিঠ চাপড়ে বলেন 'সাবাস' এবং তাদের মাল্য ভূষিত করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা পূর্ব-সীমান্তে ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালায়। ভারত-জোয়ান

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি
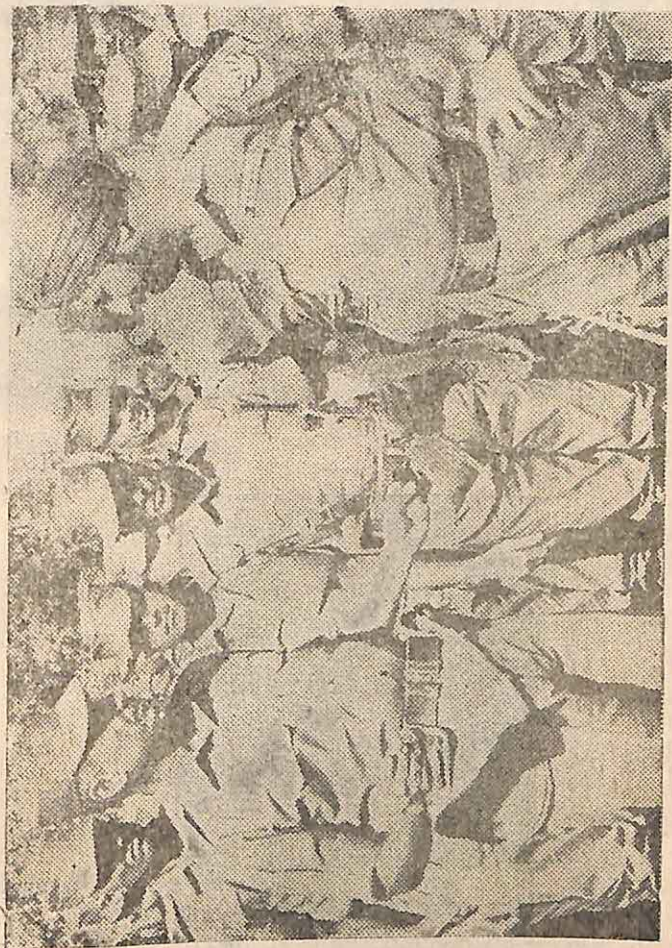
লেঃ জেঃ অরোরা সহ ভারতীয় সেনা বাহিনী

ফ্লাইট লেঃ এম. এ. গণপতি

ফ্লাইট লেঃ আর. ম্যাসি

ফ্লাইং অফিসার ডি. ল্যাজারস

১৩টি ট্যাঙ্ক ঐদিনে ধ্বংস করে। ২৫শে নভেম্বর হিলি ও বালুরঘাটে পাকিস্তানী গোলায় বহু ভারতীয় নরনারী নিহত হয়। ত্রিপুরায় আগরতলায় তারা কামানের সেল নিক্ষেপ করে। সেখানেও অসামরিক কয়েকজন ভারতীয় নিহত হয়। পাক বিমানবাহিনী পরপর ভারতের কয়েকটি বিমান ক্ষেত্রে হানা দেয় এবং বোমা বর্ষণ করে। এইদিন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি· ভি· গিরি সারা ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাত ১২টায় ঘোষণা করলেন পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। ৪ঠা ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চলের প্রধান সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট জে. অরোরা বললেন মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে সৈন্যদের লড়াই করতে হবে। ৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় নৌবহর এই লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। তারা পাকিস্তানী ২টি ডেস্ট্রয়ার, একটি সাবমেরিন ও একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ধ্বংস করেন। করাচী ও চট্টগ্রাম বন্দরে ভারতীয় বাহিনী অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। অন্য দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানে।

বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দান

৬ই ডিসেম্বার প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন—ভারত সরকার—বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন।

ভারত সরকার ৬ই ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭১ সন যে নতুন রাষ্ট্র বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিলেন জনসংখ্যার দিক থেকে তার স্থান বিশ্বে অষ্টম।

বাংলা দেশ
০ ৮০ ১৬০
কিলোমিটার
সিকিম
ভুটান
আসাম
রংপুর
দিনাজপুর
পার্বতীপুর
তিস্তামুখঘাট
বগুড়া
নেত্রকোণা
শ্রীহট্ট
সান্তাহার
ময়মনসিংহ
রাজসাহী
কিশোরগঞ্জ
টাঙ্গাইল
পাবনা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ঢাকা
আগরতলা
কুষ্টিয়া
গোয়ালন্দ
নারায়ণগঞ্জ
ফরিদপুর
কুমিল্লা
লাকসাম
যশোহর
চাঁদপুর
নোয়াখালি
খুলনা
কলিকাতা
বরিশাল
চট্টগ্রাম
ব্রহ্মপুত্র নদ
পদ্মা
কর্কটক্রান্তি
গঙ্গা নদীর মোহানা
বঙ্গোপসাগর
৯০
২৬
২৪
২২
৯২
SUDHAMOY
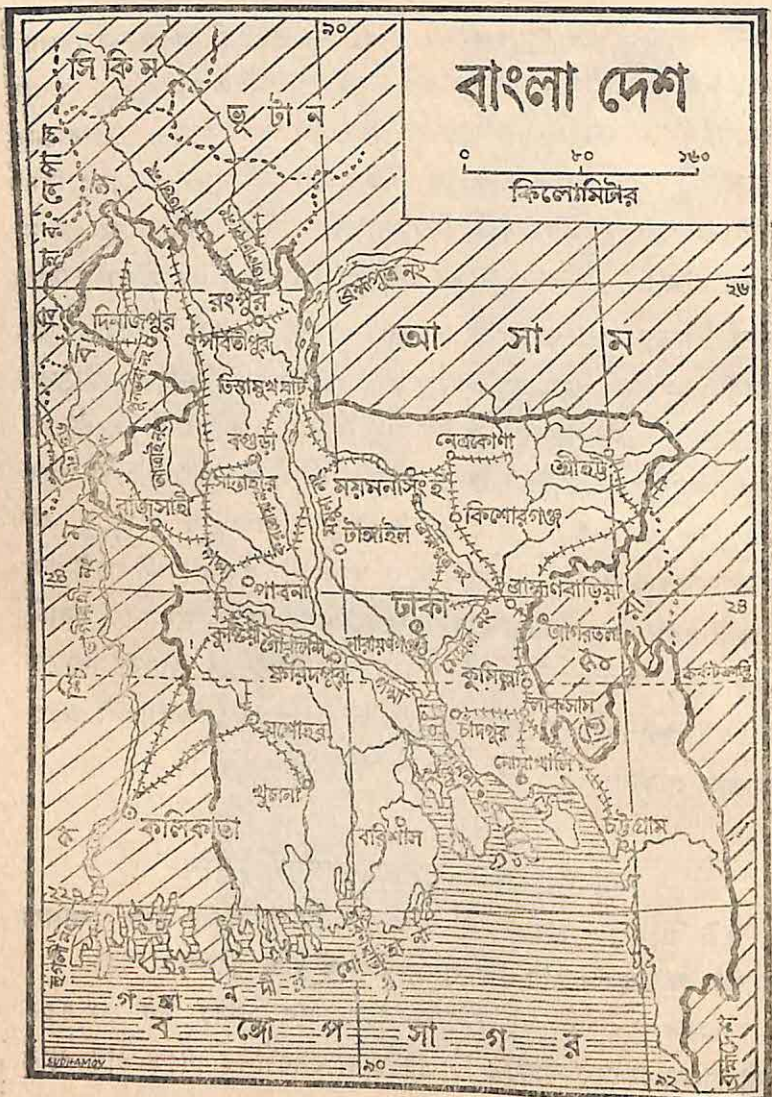
সীমা—উত্তরে ভারত, পশ্চিমে ভারত, পূর্বে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। আয়তন—৫৫১২৬ বর্গমাইল, জেলার সংখ্যা—১৯। মহকুমা—৭৭। থানা—৪১৭টি। গ্রাম—৮ হাজার। প্রধান নদী—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ইছামতী ইত্যাদি। রেল লাইন ১৮০০ মাইল। প্রধান নগর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল। ছোট শহর ৮০টি। স্বাক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ। ভাষা বাংলা।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান নানা দিক থেকে ভারত আক্রমণ করে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ঐ দিন শ্রীনগর, অমৃতসর, পাঠানকোট, আগ্রা, আমবালা, যোধপুর ও আগরতলায় বোমা বর্ষণ করে। ৮টি পাক স্যাবার জেট পুঞ্চের কাছে ভারতীর আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ে। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে পাকিস্তান কামানের গোলা ছোঁড়ে। এই খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের পাকিস্তানী আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। প্রধান-মন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ভারত-জোয়ানরা স্বদেশের অখণ্ডতা আর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম পাক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতীয় ফৌজকে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। ভারতের বিমান বাহিনীর প্রধান পি, সি, লাল পাকিস্তানের সকল বিমান ঘাঁটিগুলি খতম করার জন্য তাঁর অধীনস্থ বৈমানিকদের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভারত বনাম পাকিস্তানের আকাশযুদ্ধ। ভারতের বিমান বাহিনী পাকিস্তানের বহু বিমান
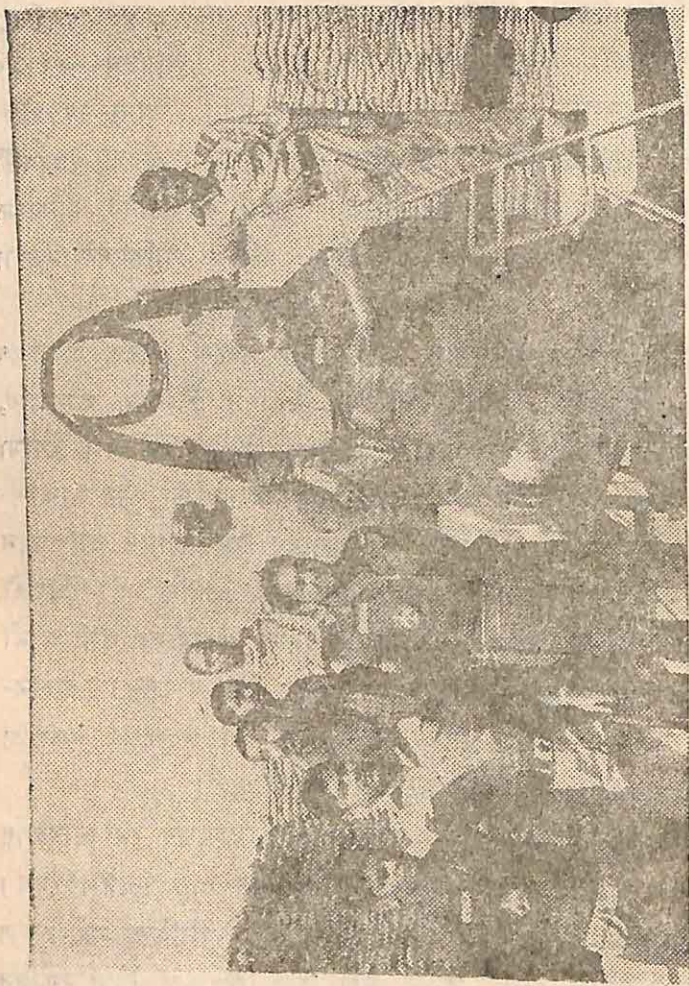
প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম তিন বৈমানিককে অভিনন্দিত করেন ; সঙ্গে রয়েছেন লেঃ জেঃ অরোরা

ধ্বংস করে। তাঁরা পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেন। পূর্বখণ্ডে ভারতের বিমান বাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে ঢুকে প'ড়ে বোমাবর্ষণ করে। পশ্চিমখণ্ডে করাচী, সারগোদা নিয়ে ৮টি ঘাঁটিতে ভারত-জোয়ানরা আঘাত হানে। ঐ দিন পাকিস্তানের ৩৩টি বিমান ধ্বংস হয়। এই প্রসঙ্গে ৬৫ সনের বিমানযুদ্ধের কথাই মনে পড়ে। ভারতের নিজস্ব ন্যাট্ বিমান যে কৃতিত্বের পরিচয় সেবার দিয়েছিল এবারেও তার অন্যথা হয় নি। পাকিস্তানের বহু স্যাবার ও মিরাজ বিমান ভারতীয় ন্যাট্ ঘায়েল করে। ভারতে তৈরী এই ন্যাট্ বিমান বিশ্বের বিস্ময়।

জলপথে ভারতের নৌ বাহিনী চট্টগ্রামের কক্স্ বাজারের উপর আঘাত হানে। চট্টগ্রামের উপকূলে ভারতের পরাক্রান্ত যুদ্ধজাহাজ 'বিক্রান্ত' ঢুকে পড়ে এবং তার বিক্রমের পরিচয় দেয়। স্থলপথে ভারত-বাহিনী নানাদিক থেকে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। ভারত জোয়ানরা বাংলা দেশের নানা জায়গা থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে বহু স্থান দখল করে। ঐ দিন কুষ্ঠিয়া জেলার দর্শনার পতন হয়। ৭ই ডিসেম্বর যশোহর ও শ্রীহট্ট ভারত-জোয়ানরা দখল করে নেয়। পাক সেনাবাহিনী যশোহর ছেড়ে মাগুরার পথে ঢাকার দিকে পলায়ন করে। পাকবাহিনী পূর্বখণ্ডে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ক'রে পশ্চিমখণ্ডের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। হাজার হাজার পাকসেনা ভারত-জোয়ানদের হাতে নিহত হয় এবং বহু পাকসৈন্য আত্মসমর্পণ করে। ভারত-বাহিনীর এই অগ্রগতির মূলে রয়েছে ভারতের জনগণ। ভারতবাসী তাঁদের গৌরব 'ভারত-জোয়ানদের' সকল রকম সহযোগিতা করে চলেছেন। আজ বিশ্বের
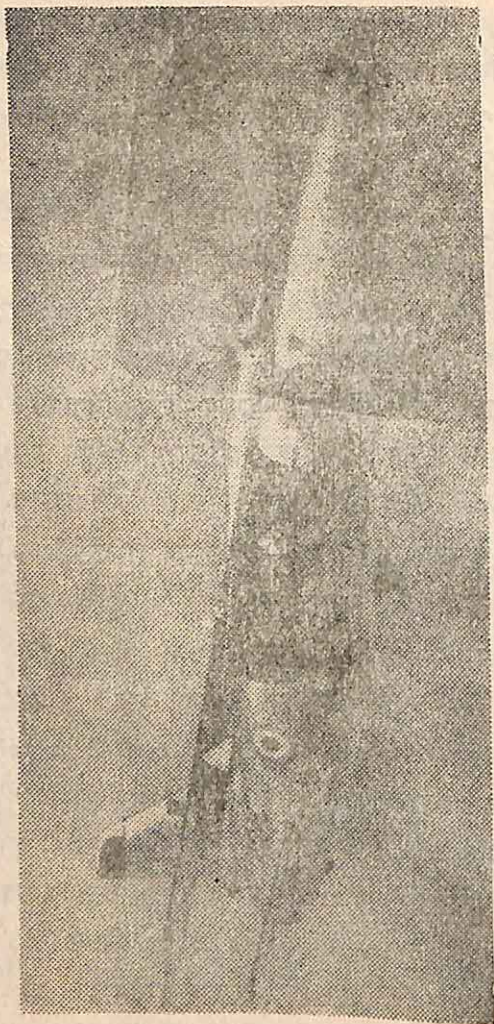
ভারতে তৈরী আধুনিক ন্যাট বিমান

চোখেও ভারতের শক্তি ঈর্ষার বস্তু। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে সকল রকম সাহায্য করে মিত্রের পরিচয় দিচ্ছে। অপর দিকে আমেরিকা ভারতের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রেসিডেন্ট্ নিক্সন পাক জঙ্গীসাহীকে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করছে এবং ভারতকে উপদেশ দিচ্ছে ভারতের সৈন্যবাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চীন ও আমেরিকার এই অপকৌশলে ধীর, স্থির এবং অবিচল রয়েছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের সকল দরবারে নিজে উপস্থিত হয়ে পাকিস্তানের বর্বর অত্যাচারের কথা জানিয়েছেন, কিন্তু নিক্সন কোম্পানীরা তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ভারত ও বাংলার দুর্দশার দর্শকমাত্র ছিলেন। পাকবাহিনী যখন ভারতের হাতে মার খেতে শুরু করল, তখন তারা রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে পর্যবেক্ষকমণ্ডলী ভারত সীমান্তে পাঠাতে চাইলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাদের এই অপকৌশল বুঝতে পেরে সম্মত হলেন না। এর জন্য নিক্সন সরকার পরক্ষে ভারতকে হুমকি দিতেও কসুর করে নি। ভারত আজ আর দুর্বল নয়—ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে।

ইতিহাসও ভারত-জোয়ানদের বীরত্বকাহিনী আজ আর অস্বীকার করবে না। গত যুদ্ধে আমেরিকার শক্তিশালী প্যাটন-ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে প্যাটন নগরী তৈরী হয়েছিল। আজ প্রতিবেশী পাক সরকারের পতনের জন্য শুধু ইয়াহিয়া খাঁন দায়ী নয়, তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর দুই সহচর—নন্দী-ভৃঙ্গী নুরল আমিন ও
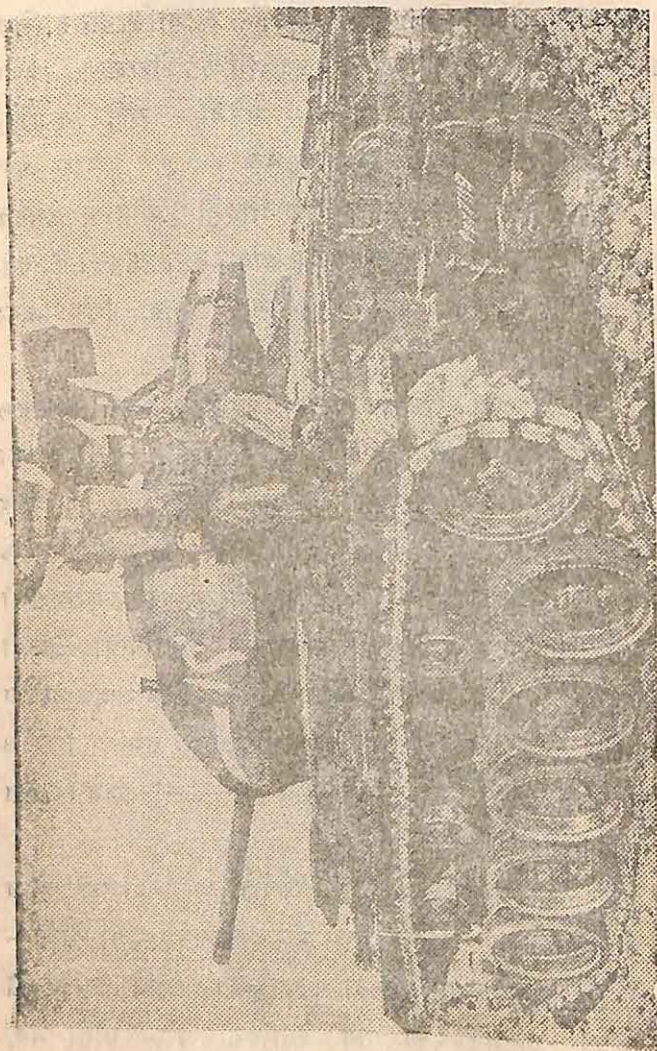
চৌগাছার যুদ্ধে ধৃত পাকিস্তানী শাফি ট্যাঙ্ক

ভূট্টো। হয়ত এই অপদেবতাদের বাংলাদেশের মাটিতে আর দেখা যাবে না। বৃটিশের নির্মিত যশোহর ক্যান্টন্মেণ্ট আজ ভারত-জোয়ানদের হাতে। যশোহর থেকে পালিয়ে যাবার সময় পাক দানবেরা প্রচুর ক্ষতি করে যায়।

ভারত-জোয়ানদের লক্ষ্য বাংলাদেশ। ভারত-জোয়ানরা বাংলায় স্বাধীনতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ চতুর্দিকে নদনদীতে ঘেরা, কিন্তু ভারত-জোয়ানরা তাদের অগ্রগতি নানা বাধা বিপত্তি সত্বেও অব্যাহত রেখে চলেছে।

এ্যাড্মিরাল এস. এম. নন্দ

এ্যাড্মিরাল এস. এম. নন্দ ১০ই অক্টোবর, ১৯১৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতেই তার চরিত্রে দেশসেবার আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। তিনি করাচী ও লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হতেই নৌবাহিনীর সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষে তিনি যুক্তরাজ্যেও গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় নৌবহরের পুনর্গঠনের কাজে এঁর অবদান অনস্বীকার্য।

এ্যাড্মিরাল এস. এম. নন্দ

নৌবাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার পর তিনি মাজাগাও ডকের ম্যানেজিং ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি ১৯৬৪-৬৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ১৯৬৬-৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং ও বর্তমানপদে উন্নীত হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম উপকূলে ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং-ইন-চিফ্ ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি অতি বিশিষ্ট সেবাপদক এবং ১৯৬৬ সালে পরম বিশিষ্ট সেবাপদক পান।

এয়ার চীফ মার্শাল পি. সি. লাল

ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান **এয়ার চীফ মার্শাল পি. সি লাল**, ৬ই ডিসেম্বর ১৯১৫ সনে লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লী ও লণ্ডনে শিক্ষা-লাভ করেন। ১৯৩৯ খৃঃ নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে রয়্যাল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগদান করেন। ১৯৪৪ এর জুন মাসে এয়ার ফোর্সের ৭ নম্বর স্কোয়াড্রনের অধিনায়কের পদ পান। ১৯৪৪-৪৫ সালে মহাযুদ্ধের সময় বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হন।

এয়ার চীফ মার্শাল পি. সি. লাল

তিনি বহুবার সরকারী প্রয়োজনে বিদেশ যাত্রা করেন। ১৯৫৭-৬২ পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যতম ডিরেক্টার ছিলেন। ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত।

জেনারেল এস. এইচ. এফ. জে. মানকেশ

ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল এস. এইচ. এফ. জে. মানকেশ। তিনি ১৯১৪ সনে ৩রা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর নানারকম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শের উড্ কলেজে, নৈনিতালে এবং ইণ্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমী দেরাদুনে, স্টাফ কলেজ কোয়েটায় এবং লণ্ডনে ইমপিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ।

জেঃ এস. এইচ. এফ. জে. মানকেশ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি বহুবার প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলের পদাতিক বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এ পদে থাকাকালীন ১৯৬৪-৬৯ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। কলকাতা-বাসীর সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। বর্তমানে তিনি দিল্লীতে আর্মি হেড্‌কোয়ার্টারে থাকেন। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার জেঃ মানকেশকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেছেন।

ভারতের নৌবাহিনী

ভারতের নৌশক্তি আজ আর দুর্বল নয়। ভারতের নৌবাহিনীতে রয়েছে ৩টি কম্যাণ্ড। ওয়েস্টার্ন ন্যাভাল কম্যাণ্ডটি একজন ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডের অধীন। এর সদর দপ্তর বোম্বাই। ইস্টার্ন ন্যাভাল কম্যাণ্ডের সদর দপ্তর বিশাখাপত্তনম্। সাউদার্ন ন্যাভালের সদর দপ্তর কোচীনে। ভারতের নৌ-বাহিনীতে রয়েছে আই. এন. এস. "বিক্রান্ত"—ফ্ল্যাগ শিপ্‌ আই. এন. এস. 'মহীশূর' ও 'দিল্লী' ক্রুজার। এছাড়া আছে দুটি স্কোয়াড্রন ডেস্ট্রয়ার আই. এন. এস. 'রনজিৎ' 'রাজপুত' 'রানা' 'গাদাবরী' 'গোমতী' ও 'গঙ্গা' এর সঙ্গে আছে কয়েকটি ফ্রিগেট স্কোয়াড্রন। তাছাড়া কয়েকটি সাবমেরিন-বিধ্বংসী নৌবহরও রয়েছে। ভারতের বিমানবাহী জাহাজ "বিক্রান্ত" ১৯৬১ সনের ৪ঠা মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হয়। ভারতীয় ফ্রিগেট বাহিনীতে আছে 'ব্রহ্মপুত্র', 'বিপাশা', 'বেতয়া', 'খুরকি', 'কৃপাণ', 'কুঠার', 'তলোয়ার' এবং 'ত্রিশূল'। আরও পূর্বের ফ্রিগেটগুলি হচ্ছে আই

এন. এস. 'কাবেরী' 'কৃষ্ণা' ও 'তীর'। সাধারণতঃ এইগুলিতে প্রশিক্ষণের কাজ হয়। এছাড়া আছে মাইন উদ্ধারকারী আই. এন. এস. 'কোঙ্কন', 'কারওয়ার', 'কাকিনাড়া' 'কারনানোড়', 'কুড্ডালোর', 'বেসিন' এবং 'বিমালাপত্তম'। এছাড়া কতকগুলি জরিপ সংক্রান্ত জাহাজ ও ট্যাঙ্কার আছে—আই. এন. এস. 'দর্শক' ভারতে তৈয়ারী প্রথম যুদ্ধজাহাজ। ভারতের কয়েকটি সাবমেরিনও রয়েছে। বর্তমানে ভারতের নৌ-সেনাপতি এডমিরাল নন্দ।

পাক-ভারত যুদ্ধ

ভারতের নৌবাহিনী পাকিস্তানের প্রধান ঘাঁটি করাচীতে আঘাত হানে। এর আগে ভারতের নৌবাহিনী পাকিস্তানের যুদ্ধ-জাহাজ 'খাইবার'কে এবং ডেস্ট্রয়ার 'সাজাহান'কে আরব সাগরে ধ্বংস করে। এই দুইখানা খতম করে ভারতীয় নৌবহর ঢুকে পড়ে পাকিস্তানের সদর দপ্তর করাচীতে। উপর থেকে ভারতীয় বিমান-বাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং অক্ষত দেহে ফিরে আসে নিজ নিজ ঘাঁটিতে। পূর্ব উপকূলে একটি পাকিস্তানী সাবমেরিন ভারতীয় নৌবাহিনীকে আঘাত হানার জন্য জলের তলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জলের তলেই ভারতীয় সাবমেরিন ওকে লক্ষ্য করে এবং টর্পেডো ছুঁড়ে মারে। বাধ্য হয়ে পাক স্যাবমেরিন জলের উপরে ভেসে ওঠে এবং উপরে ওঠা মাত্র ভারতীয় নৌবাহিনী থেকে কামান দাগা হয়। পাক সাবমেরিন চিরকালের জন্য বঙ্গোপসাগরে আল্লার নাম স্মরণ করে সলিল সমাধি গ্রহণ করে।

৭ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গণে ছামব এলাকায় ভারত বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তারা এক ডিভিসন পদাতিক, ২টি সাজোয়া রেজিমেন্ট্ বহু গোলন্দাজ সৈন্য, আকাশ পথে বিমান বাহিনী নিয়ে ভারত বাহিনীর উপরে আক্রমণ চালালে অনিবার্য কারণে ভারত-জোয়ানরা তাদের নির্ধারিত ঘাঁটিতে ফিরে আসে। ঐ দিন পাকিস্তানের ৩৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। ভারত জোয়ানরাও ১৫টি ট্যাঙ্ক হারায়। ভারতীয় সৈন্যগণ সিন্ধুর ৩৫ মাইল ভিতরে প্রবেশ করে। বার্মার এলাকায় ৪টি ঘাঁটি 'মহেন্দ্র রোপার' 'ফতে রোপার' 'বাগান' ও 'মানকৌ' ভারত জোয়ানরা দখল করে। কচ্ছে 'কালিবেগ' জ্বালেলিতে ২টি ঘাঁটি ভারতীয় সৈন্যরা দখল করে। কাগিল খণ্ডে তারা ২টি ঘাঁটি দখল করে। তা ছাড়া প্রচুর মার্কিনি অস্ত্র সস্ত্র ভারত জোয়ানরা হস্তগত করে। বীর জোয়ানরা ডেরাবাবা সেতুটি দখল ক'রে বহু পাকসৈন্য বন্দী করে এবং খেমকারন খণ্ডে 'জাপ্টান্ ওয়ালা' ও 'রোখে ওয়ালা' নামক ২টি ঘাঁটি দখল করে। ওয়াগা খণ্ডেও 'শাখহনম' গ্রামটি অধিকার ক'রে নেয়। ঐ দিন ত্রিপুরার উদরপুর মহকুমায় তিলিপাড়া ও চন্দ্রপুর গ্রামের উপর পাক বিমান বাহিনীর ২টি স্যাবার জেট্ নির্বিচারে অসামরিক লোকের উপর গুলী চালায়। ভানু সাহা নামে ১২ বছরের এক কিশোর এবং অপর এক মহিলা ২টি শিশু সন্তান সহ নিহত হয়। যশোহর অধিকার করার পরে ভারতীয় সৈন্যগণ চতুর্দিক থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। উত্তর বাংলার লালমনীর হাট ভারত সৈন্যরা করায়ত্ত করে।

পাকিস্তান বাহিনীর মনোবল পূর্বেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা

বহু পূর্বেই যশোহর ত্যাগ করে পালিয়েছে। তাদের মনোবল ও জনবলের অভাবই পতনের কারণ। সাড়ে সাত কোটী মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে ৮ মাস ধরে যুদ্ধ করায় স্বভাবতই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিবেশী ভারত যখন মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগদান করে তখন তাদের পালানো ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঢাকাই বাংলা দেশের রাজধানী হবে। ঢাকা কলিকাতা বিমান চলাচল করবে এবং ভারতীয় মুদ্রাই প্রথমে বাংলাদেশে কেনাবেচার মাধ্যম হ'বে। দুই দেশের যাতায়াতের জন্য কোন পাসপোর্ট বা ভিসার দরকার হ'বে না। কেবল মাত্র চেক্‌পোস্ট্ গুলিতে ট্রানজিট্ পারমিট্ নিয়ে যাতায়াত চলবে। বাংলা দেশের উৎপন্ন পাট ক'লকাতায় রপ্তানী করা হবে। সংখ্যা লঘুর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধেও বাংলাদেশ সরকার বিচার বিবেচনা ক'রবেন। ভারত সরকার বাংলাদেশকে জাতি গঠন মূলক কাজে ৭৫০ কোটী টাকা ঋণ দেবেন। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি হয় উপরোক্ত বিষয় গুলি ঐ চুক্তির অন্তর্গত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা দেশের ১ কোটী শরনার্থীদের আশ্রয় দিয়ে তাদের অন্ন বস্ত্র এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে প্রতিবেশী সুলভ মানবতার পরিচয় দিয়েছেন। এরজন্য ভারতের জনগণের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ আসেনি তা বলা যায় না। ভারতীয়দের অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলা দেশের নিঃসম্বল মানুষের কল্যানের জন্য ভারত বাংলার পাশে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু নিকসন সরকার পাক-ভারত যুদ্ধের জন্য ভারতকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রেছেন। এই প্রসঙ্গে সেনেটার এডওয়ার্ড

কেনেডি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন ভারত দোষী নয়। গত ৮ মাস ধরে নিকসন প্রশাসন যে নিরবতা অবলম্বন করেছেন ভারত পাক উপমহাদেশের পরিস্থিতির জন্য তাকেই দায়ী করা উচিত।

তিনি আরও বলেছিলেন এই সংকটের কারণ পূর্ববাংলার পাক জঙ্গী অত্যাচার। কেনেডি বলেছেন নিকসন প্রশাননের কার্য্য কলাপের জন্যই ভারত থেকে আমেরিকা অনেক দূরে স'রে যাচ্ছে। চীন পাকিস্তানকে মদত দিচ্ছেন একথাও তিনি স্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ বাংলাদেশকে সকল রকম ত্রান ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে পুনরায় ত্রানকার্য্য শুরু করার জন্য দাবীও জানান। সেনেটের কেনেডি অবিলম্বে সর্বত্র যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানান। নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা আমেরিকার নিলর্জ্জ পাক সমর্থনের নিন্দা করেছেন। পূর্ব জার্মানি বলেছেন পাক সামরিক নীতি এই উপমহাদেশে সমস্যার মূল কারণ। সুস্থ্য পরিবেশে শরনার্থীরা যাতে দেশে ফিরতে পারে এমন অবস্থায় পৌঁছতে পারলেই বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতের কাছে আশ্বাস চেয়েছিলেন যে তাদের একখানা বিমান ঢাকায় অবতরণ করবে। ৭ই ডিসেম্বর ৮টা থেকে ১০ টার মধ্যে ভারত যেন কোন বিমান আক্রমণ না করে, ভারত সেই অনুরোধ মঞ্জুর করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের ঐ বিমানটি ঢাকায় অবতরনের চেষ্টা করলে পাকিস্তানী বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ তা বাঞ্চাল করে দেন। বিমানটি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকায় অবতরনের পরিবর্তে রেঙ্গুনের দিকে উড়ে চলে যায়। এই জন্য ভারতকে অনুযোগ করলে প্রতিরক্ষা সচিব দিল্লীস্থ

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিকে জানান যে ৬ই ডিসেম্বর রাত ১০টা থেকে ৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ১টা পর্যন্ত ভারতীয় বিমান বহর ঢাকায় কোন বিমান আক্রমণ করেনি।

মৌলানা ভাসানি

চীনের আচরণে মৌলানা ভাসানি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, চীন অত্যাচারকে ঘৃণা করে অথচ সেই চীনই এই ব্যাপারে একেবারে স্তব্ধ। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জঙ্গী শাহির কার্য কলাপকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে নিন্দা করেন।

৮ই ডিসেম্বর ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানিয়ে দিয়েছেন বাংলা দেশ থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের লোকজনদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের বিমান ক'লকাতা বিমান বন্দর ব্যবহার করতে পারে।

৭ই ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের কাছে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির এবং সৈন্য অপসারনের দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ১০৪ এবং বিপক্ষে ১১টি ভোট পড়ে। ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩১। রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। চীন ভারতকে তীব্রতম নিন্দা করে, ভারতকে আক্রমণকারী বলে আখ্যা দিয়ে একটি প্রস্তাব আনে। যদিও এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় না। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় ভুটান, বুলগেরিয়া, বাইলোরুশিয়া, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, ভারত, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, ইউক্রেন্ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভোট দানে বিরত ছি'ল—বৃটেন, আফ্গানিস্তান, মাদাগাস্কার, নেপাল, ওম্যান, সেনেগাল ও সিঙ্গাপুর।

এই প্রস্তাবের পরিপেক্ষিতে ভারত সরকার মনে করেন বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতির স্বীকৃতি ভিন্ন পূর্ব বা পশ্চিম সীমান্তে কোন রকম যুদ্ধ বিরতি মানা সম্ভব নয়।

মার্কিন সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরের দিকে আসছে এই সংবাদে মস্কো ওয়াশিংটন্‌কে হুশিয়ার করে বলেন্ যে—এই উপমহাদেশে যা ঘ'টছে তার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। মার্কিন নৌবহর বঙ্গোপসারে কিংবা

অন্যত্র ভারতীয় নৌবাহিনীর কাজে বাধা দিলে বিশ্বযুদ্ধেরও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

বাংলা দেশের সমস্ত রণাঙ্গনে ভারতবাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত। পাকবাহিনী বাংলা ছেড়ে পালাতে তৎপর। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মান্‌কেশ পলায়নপর পাক্‌-সেনাদের হুশিয়ার করে বলেছেন আত্মসমর্পন কর, অন্যথায় মৃত্যু অবধারিত। পাক্‌সেনারা বরিশাল এবং নারায়ণগঞ্জে জড় হয়ে জলপথে পলায়নের চেষ্টা করছে। এজন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারত বাহিনী বাংলাদেশের বহুস্থান হানাদার মুক্ত করে করায়ত্ত করেছে। খুলনার কালনাও মঙ্গোলা বন্দরে ভারতীয় নৌ-বহর দুর্জয় ঘাঁটি গেড়ে বসে ছিল। ১৮৫৩ জন পাক সেনা গ্রেপ্তার হয়েছে এবং নিহতের সংখ্যা ঐ দিনেই পাঁচশতের অধিক। ঐ রণাঙ্গনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে, ২১টি পাক ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। এছাড়া বয়ড়াতে ৩টি শাফি এবং ২টি পি. টি. ৭৬ ট্যাঙ্ক ভারত জোয়ানরা অক্ষত অবস্থায় দখল করে।

ভারতীয় নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর থেকে ৬ টি পাক জাহাজকে বন্দী করে কলিকাতা বন্দরে নিয়ে আসে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সাতক্ষিরা, মাগুড়া মুক্ত করেন। ভারত জোয়ানরা তাদের কর্তব্যে অবিচল।। ভারত বাহিনীর উদ্দেশ্য পাকিস্তান দখল করা নয়। ত'ারা প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পাক্‌-বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবিচল। যে কোনো মূল্য দিয়ে ভারতীয় জোয়ানরা বাংলাদেশ মুক্ত করবেই।

৮ই ডিসেম্বর পাক্ বাহিনী সোনামুড়ার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ শুরু থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তান ১৫৫টি ট্যাঙ্ক ৭২টি বিমান ১১টি জলযান এবং ১টি সাবমেরিন হারায়। অন্য দিকে ভারতের ১৭টি ট্যাঙ্ক এবং ২৬টি বিমান ধ্বংস হয়। বিমান গুলির অধিকাংশ ঘায়েল হয় পশ্চিমরণাঙ্গনে। ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৩০টি ট্যাঙ্ক পশ্চিম পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে ২২টি ট্যাংক ঘায়েল ক'রে। বাংলাদেশে তখন দুই একটি পাক্ বিমান থাকা সম্ভব। ভারত জোয়ানদের বীরত্ব-কাহিনী বিশ্বের চতুর্দিকে আজ প্রশংসিত। আজ এই গৌরব অর্জনের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে সুস্থ এবং সবল নেতৃত্ব দিয়েছেন তা সত্যই অভাবনীয়।

তিনি ভারত জোয়ানদের নির্দেশ দিয়েছেন বর্বর ইয়াহিয়া খাঁনের দানব শক্তির হাত থেকে বাংলা দেশকে মুক্ত করতে। ইয়াহিয়া খাঁন্ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অসংযত সম্বোধন করতেও কসুর করেনি। এই প্রসঙ্গে রাজা গোপালচারী মন্তব্য করেছেন— "ওরে অশিষ্ট দানব! এখনও সময় আছে—ওরে মূঢ়! মা বলিয়া ডাক।" মহিষাসুর তার দানব শক্তির প্রভাবে নারী শক্তি শ্রীশ্রী দূর্গাকেও অবমানিত করেছিল পরে শ্রীশ্রী দূর্গা-চরণে আত্মসমর্পন করে। ইয়াখাঁনেরও উচিত তার নারকীয় নিষ্ঠুর অত্যাচার বন্ধ করে মানবোচিত পথ গ্রহণ করা। অন্যথায় তার ধ্বংস অনিবার্য্য।

পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী পূর্বখণ্ডে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। পাক সেনারা পালাবার পথ খুঁজছে কিন্তু ভারতীয় নৌবাহিনী চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে রেখেছিল। পাক সেনাদের

আত্মসমর্পনের জন্য ভারত-সেনাবাহিনী সুযোগ দিয়েছিল। পাক সেনারা দিশেহারা হয়ে খাঁচায় আবদ্ধ টিয়ে পাখীর মত ছট্‌ফট্ কোরছে। মাটির উপরে ভাঙ্গা প্যাটনের পাহাড়, আকাশে ভারতীয় ন্যাট, এবং জলপথে ভারতীয় নৌবহর সবদিক থেকেই পালাবার পথ বন্ধ। বিশেষ বিশেষ ঘাঁটিগুলি ভারত সেনাদের দখলে। ঢাকার পতন হোলেই বাংলাদেশের যুদ্ধ শেষ। পাকিস্তান দুহাত তুলে মার্কিণি মামাদের সাহায্য চাইছে। মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক চিরদিন মধুর থাকে না। এটা বোধহয় নিক্সন সরকার বুঝতে পেরে গলার স্বর খানিকটা মোলায়েম কোরেছে। চীনে মামা আস্তিন গোটালেও রাশিয়ার ভয়ে এগোতে পারছিল না। ভাগ্নে ইয়াহিয়া বেচারা বড়ই অসহায় হোয়ে পড়েছিল। মামাদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র জলযান, ট্যাঙ্ক্ প্রভৃতি ভারতীয় সেনাদের কবলে। ভারতীয় নৌবাহিনী পাকিস্তানের জাহাজ, স্টিমার, গান বোট এবং মটর বোটগুলি প্রায় সবই ডুবিয়ে দিয়েছে।

পাক ইরান্ সীমান্তে 'জওয়ানী' এবং 'সওদার' জাহাজকেও পিটিয়ে ঠাণ্ডা কোরেছে। 'মধুমতী'কে কান্ ধ'রে বোম্বাই নিয়ে যাচ্ছে। মার্কিণি মামার দেওয়া সাব্‌মেরিন 'গাজি' আজ জলের তলায় সহীদ্ হোয়েছে। পাক শক্তি তখন নাজেহাল। "পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে"। ১৯৬৫ সনের ১লা জুন পাকিস্তান 'গাজিকে' পেয়েছিল। সপ্তম বছরেই 'গাজি' কবরে স্থান নিলো। পরাদ্বিপ বন্দরের কাছে আর একটি পাক জাহাজকে ধোরে ভারতীয় নৌবহর বিশাখাপত্তনমে নিয়ে গেলো। করাচীর কাছে ৪টি জাহাজকে ঘায়েল কোরলো। পাক নৌ-শক্তির প্রায় সলীল সমাধী পর্ব্ব শেষ

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মেয়ে
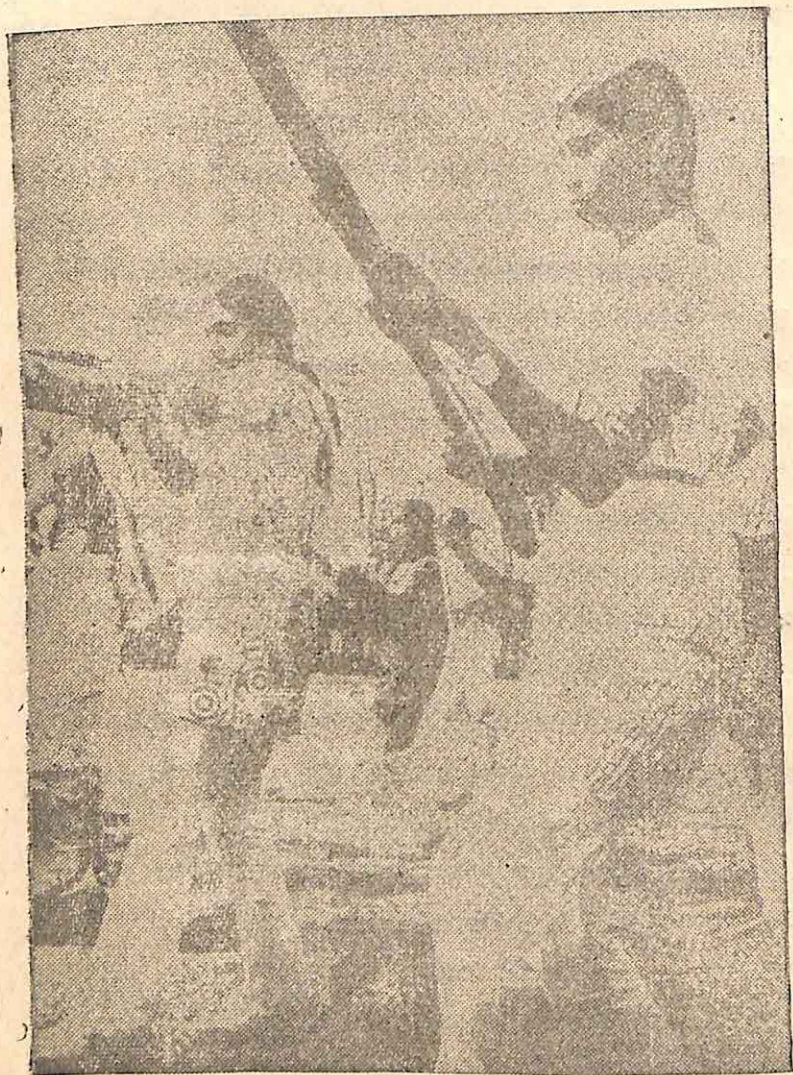
হোয়ে আসছে। পাকিস্তানীরা তখন পালাবার জন্য জলযান-গুলিতে নিরপেক্ষ দেশের পতাকা উড়িয়ে যাচ্ছে। পাকবাহিনীর কর্তৃপক্ষ গান্ বোটগুলিকে নৌবাহিনীর প্রতিকচিহ্ন সরিয়ে ফেলে অসামরিক বনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ৯ই ডিসেম্বর পাক বাণিজ্য জাহাজ 'আনোয়ার বক্স' নাম মুছে ফেলে জাপানী নাম 'আজ্জল কৃসানবার' গায়ে লিখে জাপানী পতাকা উড়িয়ে চট্টগ্রাম উপকুল দিয়ে পালাচ্ছিল। ভারতীয় নাবিকরা এই ছদ্মবেশি পাক জাহাজটিকে আটক কোরে দেখতে পান জাহাজটি পাকসেনা বোঝাই। ঐ জাহাজটিকেও ক'লকাতা বন্দরে আনা হোয়েছে। বিশ্বাখাপত্তনমে পূর্বাঞ্চলের প্রধান এ্যাডমিরাল কৃষ্ণাণ পাকিস্তানী একটি জাহাজকে ধোরে ফেলেছেন। পাকিস্তানী জাহাজ 'বাকি' গ্রীক পতাকা উড়িয়ে পালাচ্ছিল।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারত বাহিনী একই যুক্ত কমাণ্ডের অধীনে তাদের অগ্রগতী অব্যাহত রেখেছে। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ বিদেশী এবং বিদেশীয় জাহাজগুলিকে সোরে যেতে সুযোগ দিচ্ছে। তবে বিদশীয়দের অপসারনের সুযোগ যাতে অপব্যবহার না করে সেজন্যও তাদের হুশিয়ার করা হোয়েছে। ঢাকা ও করাচী থেকে বিদেশীয়দের সরিয়ে নিতে হোলে যেসব বিমানগুলি ব্যবহার করা হবে সেগুলোকে বোম্বাই ও ক'লকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চোলতে হবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার শরনার্থীরা যাতে স্বসম্মানে নীজ নীজ ঘর বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাও কোরে ফেলেছেন। শরনার্থীরা তখন দলে দলে তাদের নিজের

দেশে ফিরে যেতে আরম্ভ কোরেছে। বাংলাদেশ সরকার তার এই কৃতকার্য্যের জন্য ভারত ও রাশীয়াকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কোরেছেন সেখানে কোনো

দিনাজপুরে মুক্তিফৌজের ই. পি. আর. ইউনিট টহল দিচ্ছে।

ধর্মের বা জাতীর গোড়ামি থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল জাতী নির্বিশেষে স্বাধীন নাগরীকের সম্মান নিয়ে থাকতে পারবেন।

১০ই ডিসেম্বর হেলিকপ্টারে এবং স্টিমারে ভারতীয় সৈন্যরা মেঘনা নদী পার হোয়ে ভৈরব বাজারের কাছে ঘাঁটি স্থাপন

পাক সেনাদের নিকট প্রাপ্ত চীনদেশের আগ্নেয়াস্ত্র।

কোরেছে। ভৈরব বাজার থেকে ঢাকার দূরত্ব ৭৫ মাইল, ক্যান্টনমেণ্ট্ থেকে ৩০ মাইল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারত জোয়ানদের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে বোলেছেন "সমস্ত দেশ আপনাদের প্রশংসায় মুখর, সমস্ত জাতী আপনাদের পেছনে রোয়েছেন, লড়াই চালিয়ে যান্ আমাদের জয় সুনিশ্চিত।" পিকিং বেতার থেকে চীন ভারতকে যুদ্ধ বিরতির পরামর্শ দিয়েছে অন্যথায় ভারতকে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ কোরতে হবে। পিকিং পিপলস্ ডেয়লী বোলেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পুষ্ট হোয়ে ভারত যদি সামরিক অভিযান চালিয়ে যায় পরিণামে ভারতকে লজ্জাস্কর পরাজয়ের সম্মুখীন হোতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বহির্বিষয়ের মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং এবং পাকিস্তানের শ্রী জেড্ এ ভুট্টো নিউইয়র্ক যাত্রা কোরেছিল।

স্বাধীনদেশের স্বাধীন রাজধানী ঢাকা

১৫ই ডিসেম্বর অবরুদ্ধ ঢাকার পাক্সেনা যখন নাজেহাল এবং হতবল তখন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনানায়ক নিয়াজি নিরুপায় হয়ে মার্কিন দূতাবাস মারফৎ ভারতের সেনানায়ক জেঃ মানকেশের নিকট যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রার্থনা জানায়।

জেঃ মানকেশ সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রার্থনার জবাব পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন যুদ্ধ বিরতি নয়, আত্মসমর্পণ করুন। আপনার আজ্ঞাবহ সৈনিকদের অবিলম্বে যুদ্ধ থামিয়ে ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হুকুম দিন। নিয়াজির প্রার্থনা বার্তায় সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন পাক্ সামরিক উপদেষ্টা মেঃ জেঃ ফরমান আলি।

জেঃ মানেকশ পাক সেনাদের আত্মসমর্পনের সময় দিয়ে বেলা ৫টা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত বিমান-বাহিনীর আক্রমণ বন্ধ রাখেন। পরে নিয়াজির আবেদনে তাকে বেলা ৩টা পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করা হয়।

১৬ই ডিসেম্বর বেলা ৪টা ৩১ মিনিটের সময় পাক জেনারেল নিয়াজি ভারতের বিজয়ী বীর লেঃ জেঃ অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করে। "আমি আর আমার ফৌজ একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করলাম।" এই লিখে মুচলেখা পত্রে স্বাক্ষর করে। পরে রমনার ময়দানে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিয়াজি লেঃ জেঃ অরোরার নিকট তার রিভলবারের গুলি খুলে দিলে লেঃ জেঃ অরোরা নিয়াজির ব্যাজ খুলে নেন। বিনাসর্তে পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ ও পরাজয়ের সংবাদ সমস্ত বাংলাদেশ ও ভারতে যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন আকাশ বাতাস মুখরিত করে শুধু ধ্বনিত হতে থাকে "জয় বাংলা, জয় ভারত, জয় ইন্দিরা, জয় মুজিব", বাংলার জনগণ এবং ভারতবাসী বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময় ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক বেতার ভাষণে পাকসেনাদের আত্মসমর্পনের সংবাদ ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। ঢাকা এখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী। আমরা আমাদের নিজস্ব স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর জন্য গর্ব বোধ করছি। যে সব জোয়ানরা বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, ভারত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের স্মরণে রাখবে।

১৮ই ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি প্রধানমন্ত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সর্বোচ্চ সম্মান "ভারত-রত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান হারাবার ফলে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর উপর পশ্চিম পাকিস্তানের জনরোষের চাপ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে তিনি শ্রীজুলকিকার আলী ভুট্টোর হস্তে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। ২০শে ডিসেম্বর হতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক প্রশাসক হলেন শ্রীজুলফিকার আলী ভুট্টো। পাকিস্তানের জনগণ ইয়াহিয়াকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করে এবং প্রকাশ্য বিচার দাবী করে।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ক্ষমতালাভের পরে এক বেতার-ভাষণে অঙ্গিকার করেন যে ভারত যে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে তার বদলা তিনি নেবেনই। অপরদিকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭৩ হাজার পাক সেনা ভারতীয় সেনাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। লেঃ জেঃ নিয়াজিকে এবং পাকিস্তানের সামরিক পরামর্শদাতা মেঃ জেঃ ফরমান আলিকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়। আত্মসমর্পণ করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত পাক পশুরা যে নৃশংসতম হত্যা এবং নির্যাতম করে গিয়েছে তার নজীর ইতিহাসে বিরল। ভারতসেনারা সমস্ত বাংকার থেকে যে সব মৃতদেহ উদ্ধার করে তার মধ্যে নারীদেহের সংখ্যাই অধিক।

ভারত সেনারা হাজার হাজার লাঞ্ছিতা নারীদের পাকসেনাদের কবল থেকে উদ্ধার করে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের বীর জওয়ানরা ভারতবর্ষের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে যে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে দিলেন তা চিরদিন অমলিন থাকবে। পাকচমূদের মোকা-

বিলায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে অভূতপূর্ব সাহস, কুণ্ঠাহীন প্রত্যয় এবং সুদৃঢ় মনোবল প্রদর্শন করেছেন তা অবিস্মরণীয়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও ঢাকায় প্রত্যাবর্তন

ভারত ও বাংলাদেশ শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্ত করে বাংলাদেশে পাঠাবার জন্য পাকিস্তানের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। প্রেঃ ভুট্টো ২২শে ডিসেম্বর শেখসাহেবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েও পুনরায় গৃহবন্দী করে রাখেন। প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি না দিলে বাংলাদেশ বালুচ ও সিন্ধিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে শপথ নেয়। এই শপথবাক্য পাঠ করেন ছাত্র-লীগের সভাপতি শ্রীনুর আলম সিদ্দিকী। ৬ই জানুয়ারী প্রেঃ ভুট্টো সাংবাদিকদের কাছে বলেন—শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকা প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কখন বা কবে বঙ্গবন্ধু আসবেন তা তিনি কিছুই বলেন নি।

এই সংবাদে বাংলাদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা শহর পত্রে, পুষ্পে, তোরণে সুসজ্জিত হতে থাকে, ঢাকার বাইরে থেকেও লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকা যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

৮ই জানুয়ারি সংবাদ পাওয়া গেল বঙ্গবন্ধু মুক্ত এবং তাঁকে পাকিস্তানের ইন্টার ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের একটি বিশেষ বিমানে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাড়ে নয় মাস আটক ও গৃহবন্দী থাকার পর ৮ই জানুয়ারি মুক্তি পেলেন।

মুক্তির সংবাদে বাংলা ও ভারতের জনগণের মধ্যে বিপুল আনন্দোল্লাস পরিলক্ষিত হয়। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য—আনন্দ-বাজার পত্রিকার অমিতাভ চৌধুরী কলকাতা থেকে প্রথম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ও পশ্চিম-বাংলার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে প্রণাম জানান।

৮ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু ভোর তিনটা নাগাদ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে রওনা হয়ে বারটা পাঁচ মিনিটে লণ্ডনের হীথরোডে অবতরন করেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন—বাংলাদেশ বাস্তব সত্য। তার সত্তাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি বিশ্বের কাছে দাবী জানান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য করতে হবে।

বাংলাদেশের এই মরণজয়ী সংগ্রামে ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ভুটান যে সমর্থন জানিয়েছে তার জন্য তিনি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানান।

লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীআপ্পাজান এক বার্তায় জানান বঙ্গবন্ধু প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী।

লখনউ-এর রাজভবন থেকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলার প্রধান নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে কথা বলেন এবং এবং নয়া দিল্লীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন—তাঁর মুক্তি বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের এবং বিশ্বের জনমতের জয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের জনগণকে তার কৃতজ্ঞতা জানান। প্রত্যুত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন—

স্বাধীনতার জন্য আপনি আপনার জনগণকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন বস্তুতঃ আমরাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীআজাদ বলেন—বাংলাদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

লণ্ডনের ক্লারিজেস্ হোটেল থেকে ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশ কমেট বিমানটি বাংলার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে ৯টা বেজে ২ মিনিটে অবতরণ করা মাত্র ২১ বার তোপধ্বনি করা হয় ভারতের সেনা বাহিনী বাংলার রাষ্ট্র প্রধানকে গারড্ অব অনার প্রদর্শন করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলা দেশেরপররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীআবদুস সামাদ তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যান। সহস্র কণ্ঠে "জয় বাংলা" "জয় হিন্দ" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সামরিক ব্যাণ্ডে দুই দেশের জাতীয় সংগীত বেজে ওঠে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে আলিঙ্গন করে বলেন—'হে বিজয়ী বীর, ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে তোমারই নেতৃত্বে গড়া বাংলা দেশ এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সহায়তা করবে এই আশা নিয়েই তোমাকে আমরা ভারতের এই পুণ্য ভূমিতে স্বাগত জানাই।

"আমার দেশ, তোমার দেশ" "ভারত ও বাংলা দেশ" আজ অচ্ছেদ্য মৈত্র বন্ধনে আবদ্ধ—শান্তি, গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজ বাদের কঠিন সাধনার পথে চলবে বলে অঙ্গীকারে আবদ্ধ। মানব স্বাধিনতা ও মানবমুক্তির জন্য যুগে যুগে যে মানব-আত্মা, নির্যাতন সহ্য করে এসেছে, দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে, তোমার মধ্য

দিয়ে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শকে দেখতে পেলাম। স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাববও ও ইতিহাসের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধ্যায়ে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কোন সন্দেহ নেই তোমার দেশ রাষ্ট্র সমাজে গৌরবের আসনের অধিকারী হবে। আমরা—ভারত সরকার ও ভারতের জনগন তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য অধৈর্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করে এসেছি। শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে তোমার দেশ ও তুমি জয়ী হও।" সংবর্ধনার জবাবে শেখ মুজিবর রহমান বলেন—"এই বিরাট দেশ, ইতিহাসখ্যাত রাজধানীতে আমার পদার্পন, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে রইল, অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে যাত্রাপথে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম ভারতের অনন্যা ও অসাধারণ প্রধানমন্ত্রীকে—দেখে গেলাম ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুধু কঠোর ও অতুলনীয় তাঁর দেশেরই নেত্রী নন—তিনি সমগ্র মানব জাতির নেত্রী। মুক্তির সূর্যালোকে উদ্ভাসিত বাংলা দেশের দিকে আমার যাত্রা যাঁরা ত্যাগের দ্বারা সম্ভব করে তুলেছেন, সেই ভারতের জনসাধারণের জন্যও আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা রেখে গেলাম।"

রাষ্ট্রীয় অতিথিদের জন্য ভারত সরকার নতূন যে মারসিডিজ বেনজ মোটর গাড়ীটি কিনেছেন শেখ সাহেবই তা প্রথম ব্যবহার করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঐ গাড়ীকরে বঙ্গবন্ধুকে গ্যারিসন প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে এলে লক্ষ লক্ষ লোকের এক বিরাট জনতা শেখ সাহেবকে সংবর্ধনা জানায় এবং "জয় বাংলা" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে।

দশফুট উচূ এক মঞ্চের উপরে দাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা

গান্ধী বলেন—আজ সর্বাধিক আনন্দের দিন—এই দেশ, এই গভর্ণমেণ্ট এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম শেখ মুজিবরকে মুক্ত করে আনব, মুক্তবাহিনীকে সাহায্য করব এবং বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে ফেরার পথ করে দেব। তিনটি প্রতিশ্রুতিই পালন করা হয়েছে।

শেখ সাহেব ইংরাজীতে ভাষণদিতে সুরু করলে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বাংলায় বলতে অনুরোধ করেন। শেখ সাহেব তাঁর ভাষণ শেষ করে উচ্চ কণ্ঠে বলেন—"জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় ইন্দিরা গান্ধী" প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মাইকের সামনে এসে বলেন—অপেনারাও আমার সঙ্গে বলুন "শেখ মুজিবর রহমান জিন্দাবাদ"। লক্ষকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—"জিন্দাবাদ"।

দিল্লী থেকে বিজয়ী বীর—শেখ মুজিবর রহমান তেজগাঁও বিমান বন্দরে তাঁর মাতৃভূমিতে পদার্পণ করেন। তখন স্থানীয় সময় বেলা একটা আটচল্লিশ। ৩১ বার তোপ-ধ্বনি হল। রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাল তাঁর মুক্ত মাতৃভূমি।

শেখ মুজিবর রহমান

জাতীয় সঙ্গীত
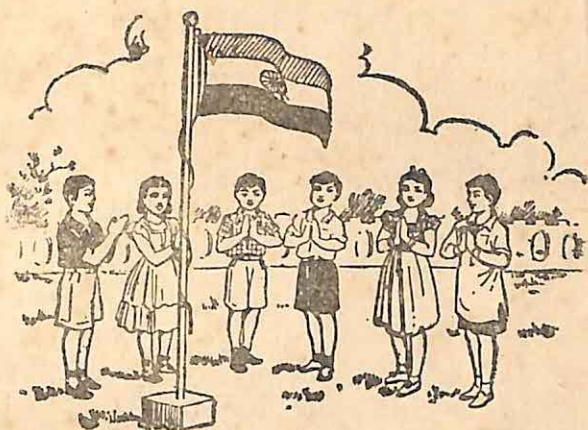
জনগণমন-অধিনায়ক জয়হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা !
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা !

জনগণমঙ্গলদায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

* * *

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী।
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে।
প্রেমহার হয় গাঁথা।

জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্ত

রণাঙ্গনে

ভারত-জোয়ান